BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

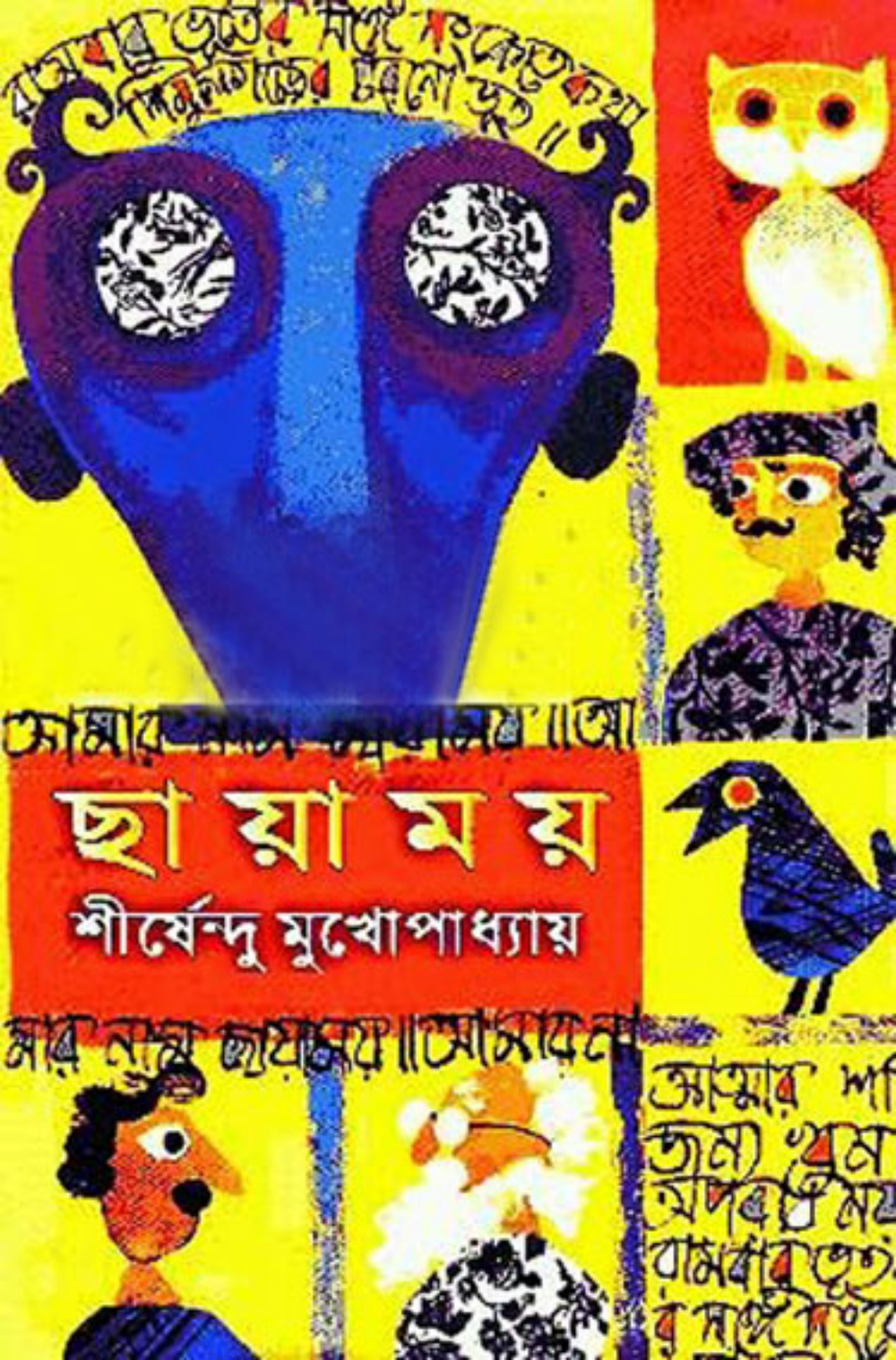
ছা য়া ম য়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছায়াময়ী

ধৃতির রিভলভার নেই কিন্তু হননেচ্ছা আছে। এই ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে তার জীবনে তেমন কোনও মহিলার আগমন ঘটল না, তা বলে কি তার হৃদয়ে নারীপ্রেম নেই? ঈশ্বর বা ধর্মে তার কোনও বিশ্বাসই নেই, তবু সে জানে যে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। একজন বা একাধিক জ্যোতিষী তাকে ওই সতর্কবাণী শুনিয়েছে।

রাত দুটো। তবু এখন টেলিপ্রিন্টার চলছে ঝড়ের বেগে। চিফ সাব-এডিটর উমেশ সিংহ প্রেসে নেমে গেছেন খবরের কাগজের পাতা সাজাতে। দেওয়ার মতো নতুন খবর কিছু নেই আজ। বাকি তিনজন সাব-এডিটরের একজন বাড়ি চলে গেছে, দু'জন ঘুমোচ্ছে। ধৃতি একা বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পায়জামা। টেলিপ্রিন্টারের খবর সে অনেকক্ষণ দেখছে না। কাগজ লম্বা হয়ে মেশিন থেকে বেরিয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছে। এবার একটু দেখতে হয়।

ধৃতি উঠে জল দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নেয়। তারপর মেশিনের কাছে আসে। মাদ্রাজে আমের ফলন কম হল এবার, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, যুগোশ্লাভিয়া ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রশংসা করেছে, ইজরায়েলের নিন্দা করছে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র। কোনও খবরই যাওয়ার নয়। একটা ছোট্ট খবর কাগজের লেজের দিকে আটকে আছে। প্লেন ক্র্যাশে ব্যাঙ্গালোরে দু'জন শিক্ষার্থী পাইলট নিহত। যাবে কি খবরটা? ইন্টারকম টেলিফোন তুলে বলল, উমেশদা, একটা ছোট প্লেন ক্র্যাশের খবর আছে। দেব?

কোথায়?

ব্যাঙ্গালোর।

ক'জন মারা গেছে?

দু'জন।

রেখে দাও। আজ আর জায়গা নেই। এমনিতেই বহু খবর বাদ গেল। ত্রিশ কলম বিজ্ঞাপন।

আচ্ছা।

ধৃতি বসে থাকে চুপ করে। অনুভব করে তার ভিতর হননেচ্ছা আছে, প্রেম আছে, আর আছে সুপ্ত সন্ন্যাস। বয়স হয়ে গেল ত্রিশের কাছাকাছি। ত্রিশ কি খুব বেশি বয়স?

টেলিফোন বেজে ওঠে। এত রাতে সাধারণত প্রেস থেকেই ফোন আসে। উমেশদা হয়তো কোনও হেডিং পালটে দিতে বলবে বা কোনও খবর ছাঁট-কাট করতে ডেকে পাঠাবে। তাই ধৃতি গিয়ে ইন্টারকম রিসিভারটা তুলে নেয়। তখনই ভুল বুঝতে পারে। এটা নয়, অন্য টেলিফোনটা বাজছে। বাইরের কল।

দ্বিতীয় রিসিভারটা তুলেই সে বলে, নিউজ।

ওপাশে অপারেটারের গলা পাওয়া যায়, এলাহাবাদ থেকে পি পি ট্রাঙ্ককল। ধৃতি রায়কে চাইছে।

রাত দুটোর সময় মাথা খুব ভাল কাজ করার কথা নয়। তাই এলাহাবাদ থেকে তার ট্রাঙ্ককল শুনেও সে তেমন চমকায় না। একটু উৎকর্ণ হয় মাত্র। তার তেমন কোনও নিকট আত্মীয়স্বজন নেই, স্ত্রী বা পুত্রকন্যা নেই, তেমন কোনও প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। কাজেই দুঃসংবাদ পাওয়ার কোনও ভয়ও নেই তার।

এলাহাবাদি কণ্ঠটি খুবই ক্ষীণ শোনা গেল, হ্যালো! আমি ধৃতি রায়ের সঙ্গে—

ধৃতি রায় বলছি।

মাত্র তিন মিনিট সময়, কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন।

বলা যাবে না। শুধু বলে রাখি, আমি টুপুর মা। টুপুকে ওরা মেরে ফেলেছে, বুঝলেন? খবরটা আপনার কাগজে ছাপবেন কিন্তু! শুনুন, সবাই এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিচ্ছে। প্লিজ, বিশ্বাস করবেন না। আপনি লিখবেন টুপু খুন হয়েছে।

অধৈর্য ধৃতি বলে, কিন্তু টুপু কে?

আমার মেয়ে।

আপনি কে?

আমি টুপুর মা।

আপনি আমাকে চেনেন?

চিনি। আপনি খবরের কাগজে কাজ করেন। মাঝে মাঝে আপনার নামে লেখা বেরোয় কাগজে। নামে চিনি।

আমি যে নাইট শিফটে আছি তা জানলেন কী করে?

আজ বিকেলে আপনার অফিসে আর একবার ট্রাঙ্ককল করি, তখন অফিস থেকে বলেছে।

শুনুন, আপনার মুখের খবর তো আমরা ছাপতে পারি না, আপনি বরং ওখানে আমাদের যে করেসপন্ডেন্ট আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

না, না। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না। টুপুকে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন।

ধৃতি বুঝতে পারে এলাহাবাদি পুরো পাগল। সে তাই গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, তা হলে বরং ঘটনাটা আদ্যোপান্ত লিখে ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

ছাপবেন তো?

দেখা যাক।

না, দেখা যাক নয়। ছাপতেই হবে। টুপু যে খুন হয়েছে সেটা সকলের জানা দরকার। খবরের সঙ্গে ওর একটা ছবিও পাঠাব। দেখবেন টুপু কী সুন্দর ছিল! অদ্ভুত সুন্দর। ওর নামই ছিল মিস এলাহাবাদ।

তাই নাকি?

পড়াশুনোতেও ভাল ছিল।

অপারেটর তিন মিনিটের ওয়ার্নিং দিতেই ধৃতি বলল, আচ্ছা ছাড়ছি।

ছাপবেন কিন্তু।

ধৃতির কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ফোন ছেড়ে সে উঠে মেশিন দেখতে থাকে। বাণিজ্য-মন্ত্রীর বিশাল এক বিবৃতি আসছে পার্টের পর পার্ট। এরা যে কী সাংঘাতিক বেশি কথা বলতে পারে! আর কখনও নতুন কথা বলে না।

টেবিলের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। ধৃতি আর মেশিন পাহারা না দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। সিগারেট শেষ হলেই চোখ বুজবে।

চোখের দুটো পাতা চুম্বকের টানে জুড়ে আসছে ক্রমে। মাথার দিকে অল্প দূরেই টেলিপ্রিন্টার ঝোড়ো শব্দ তুলে যাচ্ছে। রিপোর্টারদের ঘরে নিষ্ফল টেলিফোন বেজে বেজে এক সময়ে থেমে গেল। মাথার ওপরকার বাতিগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে সহদেব বেয়ারা। আবছা অন্ধকারে হলঘর ভরে গেল।

সিগারেট ফেলে ফিরে শুল ধৃতি। উমেশদা প্রেস থেকে কাগজ ছেড়ে উঠে এল, আধো ঘুমের মধ্যেও টের পেল সে।

অনেকদিন আগে স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছিল ধৃতি। তখন ব্যাঙ্কের অল্পবয়সি কর্মীদের কয়েকজন তাকে ধরল, আপনি ধৃতি রায়? খবরের কাগজে ফিচার লেখেন আপনিই তো?

সেই থেকে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। স্টেট ব্যাঙ্কের ওপরতলায় কমন রুম আছে। সেখানে আজকাল বিকেলের দিকে অবসর পেলে এসে টেবিল টেনিস খেলে।

আজও খেলছিল। টেবিল টেনিস সে ভালই খেলে। ইদানীং সে জাপানি কায়দায় পেন হোল্ড গ্রিপে খেলার অভ্যাস করছে। এতে একটা অসুবিধে যে ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না। বাঁ দিকে বল পড়লে হয় কোনওক্রমে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয়তো বাঁ দিকে সরে গিয়ে বলটাকে ডানদিকে নিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হয়। তবে এই কলম ধরার কায়দায় ব্যাট ধরলে মারগুলো হয় ছিটেগুলির মতো জোরালো। সে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য খেলে না, এমনিতেই খেলে। কিন্তু ধৃতি যা-ই করে তাতেই তার অখণ্ড মনোযোগ।

আর এই মনোযোগের গুণেই সে যখনই যা করে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেয় সে যে কয়েকটা ফিচার লিখেছে তার সবগুলোই ভালভাবে উতরে যায়। তার ফলে বাজারে সে সাংবাদিক হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। নাম বলতেই অনেকে চিনে ফেলে। অবশ্য এর এক জ্বালাও আছে।

যেমন স্টেট ব্যাঙ্কে যে নতুন এক টেকো ভদ্রলোক এসেছেন সেই ভদ্রলোকটি তাকে আজকাল ভারী জ্বালায়। নাম অভয় মিত্র, খুবই রোগা, ছোট্ট, ক্ষয়া একটি মানুষ। গায়ের রং ময়লা। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, কিন্তু এর মধ্যেই অসম্ভব বুড়িয়ে রসকষহীন হয়ে গেছে চেহারা। চোখদুটোতে একটা জুলজুলে সন্দিহান দৃষ্টি। অভয় মিত্র তার নাম শুনেই প্রথম দিনই গম্ভীর হয়ে বলেছিল, দেশে যত অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে তার বিহিত করুন। আপনারাই পারেন।

কে না জানে যে এ দেশে প্রচুর অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে! আর এও সকলেরই জানা কথা যে কিছু করার নেই।

কিন্তু অভয় মিত্র ধৃতিকে ছাড়েন না। দেখা হলেই ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকেন, আপনারা কী করছেন বলুন তো? দেশটা যে গেল!

ধৃতি খুবই ধৈর্যশীল, সহজে রাগে না। কিন্তু বিরক্ত হয়। বিরক্তি চেপে রেখে ধৃতি বলে, আমার কাগজ আমাকে মাইনে দেয় বটে, কিন্তু দেশকে দেখার দায়িত্ব দেয়নি অভয়বাবু। দিলেও কিছু তেমন করার ছিল না। খবরের কাগজ আর কতটুকু করতে পারে?

অভয় হাল ছাড়েন না। বলেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখুন। শয়তানদের মুখোশ খুলে দিন।

অভয় মিত্রের ধারণা খুবই সহজ ও সরল। তিনি জানেন কিছু মুখোশ-পরা লোক আড়াল থেকে দেশটার সর্বনাশ করছে। শোষণ করছে, অত্যাচার করছে, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, কালো টাকা জমানো থেকে সব রকম দুষ্কর্মই করছে একদল লোক।

তারা কারা?— একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ধৃতি।

তারাই দেশের শত্রু। আমি আপনাকে অনেকগুলো কেস বলতে পারি।

শুনব'খন একদিন।

এইভাবে এড়িয়েছে ধৃতি।

আজও টেবিল টেনিস খেলার দর্শকের আসনে অভয় মিত্র বসা। তিনি কোনওদিনই খেলেন না। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে বসে থাকেন। ধৃতি স্টেট ব্যাঙ্কের সবচেয়ে মারকুটে খেলোয়াড় সুব্রতকে এক গেমে হারিয়ে এসে চেয়ারে বসে দম নিচ্ছিল।

অভয় মিত্র বললেন, আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি ইন্টেলেকচুয়ালরা সি আই এ-র টাকা খায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে নির্বিকার ভাবে বলল, খায়।

সে কথা আপনারা কাগজে লেখেন না কেন?

আমিও খাই যে।— বলে ধৃতি হাসল।

না না, ইয়ারকির কথা নয়। আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলি। ময়নাগুড়িতে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার গেল একবার। অতি সৎ লোক। কিন্তু কন্ট্রাক্টররা তাকে কিছুতেই ঘুষ না দিয়ে ছাড়বে না। তাদের ধারণা ঘুষ না নিলে ছোকরা সব ফাঁস করে দেবে। যখন কিছুতেই নিল না তখন একদিন দুম করে ছেলেটাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হল। এ ব্যাপারটাকে আপনি কী মনে করেন?

খুব খারাপ।

ভীষণ খারাপ ব্যাপার নয় কি?

ভীষণ।

এইসব চক্রান্তের পিছনে কারা আছে সে তো আপনি ভালই জানেন।

এইসব চক্রান্ত ফাঁস করে দিন।

দেব। সময় আসুক।

সময় এসেছে, বুঝলেন! সময় এসে গেছে। ইন্ডিয়া আর চায়নার বর্ডারে এখন প্রচণ্ড মবিলাইজেশন শুরু হয়ে গেছে।

বটে? খবর পাইনি তো!

খবর আপনারা ঠিকই পান, কিন্তু সেগুলো চেপে দেন। আপনাকে আরও জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজির রেগুলার টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। নেতাজি সন্ন্যাস ছেড়ে আসতে চাইছেন না। কিন্তু হয়তো তাঁকে আসতেই হবে শেষ পর্যন্ত। আপনারাও জানেন যে নেতাজি বেঁচে আছেন, কিন্তু খবরটা ছাপেন না।

ধৃতি বিরক্ত হয় না। মুখ গম্ভীর করে বলে, তা অবশ্য ঠিক। সব খবর কি ছাপা যায়?

কিন্তু মুখোশ একদিন খুলে যাবেই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে।

ধৃতির সময় নেই। আবার নাইট শিফট। ঘড়ি দেখে সে উঠে পড়ে। ধৃতি আগে থাকত একটা মেসে। তার বন্ধু জয় নতুন একটা ফ্ল্যাট কিনল বিস্তর টাকার ঝুঁকি নিয়ে। প্রথমেই থোক ত্রিশ হাজার দিতে হয়েছিল, তারপর মাসে মাসে সাড়ে চারশো করে গুনে যেতে হচ্ছে। চাকরিটা জয় কিছু খারাপ করে না। সে বিলেতফেরত এঞ্জিনিয়ার, কলকাতার একটা এ-গ্রেড ফার্মে আছে। হাজার তিনেক টাকা পায়। কাট-ছাঁট করে আরও কিছু কম হাতে আসে।

জয়ের বয়স ধৃতির মতোই। বন্ধুত্বও খুব বেশি দিনের নয়। তৃতীয় এক বন্ধুর সূত্রে ওলিম্পিয়া রেস্টুরেন্টে ভাব হয়ে গিয়েছিল। পরে খুব জমে যায়।

জয় একদিন এসে বলল, একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। একটা ঘর আছে, তুমি থাকবে?

একটু দোনা-মোনা করেছিল ধৃতি। মেসের মতো অগাধ স্বাধীনতা তো বাড়িতে পাবে না।

দ্বিধাটা বুঝে নিয়ে জয় বলল, আরে আমার হাউসহোল্ড কি আর পাঁচজনের মতো নাকি! ইউ উইল বি ফ্রি অ্যাজ লাইট অ্যান্ড এয়ার। মান্থলি ইনস্টলমেন্টটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে ভাই, একা বিয়ার করতে পারছি না। তুমি যদি শেয়ার করো তা হলে আমি বেঁচে যাই।

ওরা ব্যাচেলর সাবটেনান্ট খুঁজছে। ধৃতির চেয়ে ভাল লোক আর কাকে পাবে? ধৃতির আত্মীয়স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধবী নেই। ফলে হুটহাট লোকজন আসবে না।

ধৃতি রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে সে জয়ের একডালিয়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে আছে। দু'তলায়

দক্ষিণ-পূর্বমুখী চমৎকার আস্তানা। সামনের দিকের বেডরুমটা ধৃতি নিয়েছে। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকে। খাওয়া-দাওয়া থাকলে ধৃতির বাঁধা নেমন্তন্ন থাকে। ধৃতি প্রতি মাসে দু'শো টাকা করে দেয়।

ধৃতি যখন ফিরল তখন প্রায় সাতটা বাজে। নাইট শিফট শুরু হবে ন'টায়। সময় আছে।

কলিং-বেল টিপতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। সামনের সিটিং-কাম-ডাইনিং হলের মাঝখানের বিশাল টানা পরদাটা সরানো। খাওয়ার টেবিলের ওপর প্লেটে পেঁয়াজ কুচি করছিল পরমা। আর আঁচলে চোখ মুছছিল।

পরমা দারুণ সুন্দরী। ইদানীং সামান্য কিছু বেশি মেদ জমে গেছে, নইলে সচরাচর এত সুন্দরী দেখাই যায় না। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে পরমা অত্যন্ত সচেতন। কখনও তাকে না-সাজা অবস্থায় ঘরেও দেখেনি ধৃতি। যখনই দেখে তখনই পরমার মুখে মৃদু বা অতিরিক্ত প্রসাধন, চোখে কাজল, ঠোঁটে কখনও হালকা কখনও গাঢ় লিপস্টিক, পরনে সব সময়ে ঝলমলে শাড়ি। তেইশ-চব্বিশের বেশি বয়স নয়।

ধৃতি শিস দিতে দিতে দরজা দিয়ে ঢুকেই বলল, পরমা, কাঁদছ?

কাঁদব না? পেঁয়াজ কাটতে গেলে সবারই কান্না আসে।

আমার চিঠি-ফিটি কিছু এল শেষ ডাকে?

কে চিঠি দেবে বাবা! রোজ কেবল চিঠি!

চিঠি দেওয়ার লোক আছে।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, সে সব তো আজে-বাজে লোকের চিঠি। কে লেখা ছাপাতে চায়, কে খবর ছাপাতে চায়, কে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। ওসব কি চিঠি নাকি? আপনি প্রেমপত্র পান না কেন বলুন তো?

ধৃতি নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে বলে, দেখো ভাই বন্ধুপত্নী, যাদের পারসোনালিটি থাকে তাদের সকলেই ভয় পায়। আমাকে প্রেমপত্র দিতে কোনও মেয়ে সাহস পায় না।

ইস্! বেশি বকবেন না। নিজে একটি ভিতুর ডিম। মেয়ে দেখলে তো খাটের তলায় লুকোন।

কবে লুকিয়েছি?

জানা আছে।

ঠোঁট ওলটালে পরমাকে বড় সুন্দর লাগে। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। ধৃতি তাই স্থির চেয়ে থাকে একটু। মৃদু একটু মুগ্ধতার হাসি তার মুখে।

কোন মেয়ে না পুরুষের দৃষ্টির সরলার্থ করতে পারে! পরমা বরং তা আরও বেশি পারে। কেন না সুন্দরী বলে সে ছেলেবেলা থেকেই বহু পুরুষের নজর পেয়ে আসছে।

ধৃতি বলল, পরমা তোমার কেন একটা ছোট বোন নেই বলো তো?

থাকলে বিয়ে করতেন?

আহা, বিয়ের কথাটা ফস করে তোলা কেন? অন্তত প্রেমটা তো করা যেত।

প্রেম করতে কলজের জোর চাই সাংবাদিক মশাই। যত সস্তা ভাবছেন অত নয়।

বিয়ের আগে তুমি ক'টা প্রেম করেছ? কমিয়ে বোলো না, ঠিক করে বলো তো!

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, অনেক। কতবার তো বলেছি।

কোনওবারই সঠিক সংখ্যাটা বলোনি।

হিসেব নেই যে।

সেই সব রোমিওদের সঙ্গে এখন আর দেখা হয় না?

একেবারে হয় না তা নয়।— বলে পরমা একটু চোখ পাকিয়ে মৃদু হাসে।

তাদের এখন অবস্থা কী?

প্রথম-প্রথম অক্সিজেন কোরামিন দিতে হত, এখন সব সেরে উঠছে।

ধৃতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, বাস্তবিক, একজন সুন্দরী মেয়ে যে কত পুরুষের সর্বনাশ করতে পারে!

পুরুষরা তো সর্বনাশই ভালবাসে।

শিস দিতে দিতে ধৃতি ঘরে ঢোকে। পরমা বাইরে থেকে বলে, চা চাই নাকি?

দেবে?

খেলে দেব না কেন? আহা, কী কথা!

দাও তা হলে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট-ফিস্কুট দিয়ো না আবার! আমি নেকেড চা ভালবাসি।

পরমা অত্যন্ত দুষ্টু একটা জবাব দিল, অত নেকেড ভালবাসতে হবে না।

ঘরে একা ধৃতি একটু হাসল।

তার ঘরটা অগোছালো বটে কিন্তু দামি জিনিসের অভাব নেই। একটা স্টিলের হাফ-সেকরেটারিয়েট টেবিল জানলার পাশে, টেবিলের সামনে রিভলভিং চেয়ার, তার সিঙ্গল খাটে ফোম রবারের তোষক। মহার্ঘ্য বুককেস। একটা চারহাজারি স্টিরিয়ো গ্রামোফোন, একটা ছোট্ট জাপানি রেডিয়ো। যা রোজগার তার সবটাই কেবলমাত্র নিজের জন্য খরচ করতে পারে সে।

নিকট-আত্মীয় বলতে এক দাদা আর দিদি আছে তার। দাদা বেনারসে রেলের বুকিং ক্লার্ক। দিদি স্বামী-পুত্র নিয়ে দিল্লি প্রবাসিনী। সারা বছর ভাই-বোনে কোনও যোগাযোগ নেই। বিজয়া বা নববর্ষে বড়জোর একটা পোস্টকার্ড আসে, একটা যায়। তাও সব বছর নয়। আত্মীয়তার বন্ধন বা দায় নেই বলে ধৃতির খারাপ লাগে না। বেশ আছে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, যেবার সে অফিসের কাজে দিল্লি যায়। দিদির বাড়িতে ওঠেনি, অফিস হোটেল-খরচ দিয়েছিল। দেখা হয়েছিল এক বেলার জন্য। ধৃতি দেখেছিল দিদি নিজের সংসারের সঙ্গে কী গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। ভাই বলে ধৃতিকে আদরের ত্রুটি করেনি, তবু ধৃতির নিজেকে পর মনে হয়েছিল। দাদা অবশ্য সে তুলনায় আরও পর। দিদি সেবার একটা দামি প্যান্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, ভাইয়ের হাত ধরে বিদায়ের সময়ে কেঁদেও ফেলে। কিন্তু দাদা সেরকম নয়। বছরখানেক আগে বেনারসে দাদার ছেলের পৈতে উপলক্ষ্যে গিয়ে ধৃতি প্রথম বুঝতে পারে যে না এলেই ভাল হত। দাদা তার সঙ্গে তেমন করে কথাই বলেনি, আর বউদি নানাভাবে তাকে শুনিয়েছে তোমার দাদার একার হাতে সংসার, কেউ তো আর সাহায্য করার নেই। খোঁজই নেয় না কেউ। এসব খোঁটা দেওয়া ধৃতির ভাল লাগে না। সে নিজে একসময়ে দাদার পয়সায় খেয়েছে পরেছে ঠিকই, কিন্তু বউদি যখন বলল, তোমার দাদা তো সকলের জন্যই করেছে, এখন তার জন্য কেউ যদি না করে তবে তো বলতেই হয় মানুষ অকৃতজ্ঞ, তখন ধৃতির ভারী ঘেন্না ধরে ভিখিরিপনা দেখে। কলকাতায় এসে সে দু'মাসে হাজারখানেক টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়।

পরমা নিজেই চা নিয়ে আসে। ধৃতি লক্ষ করে অল্প সময়ের মধ্যেই পরমা শাড়ি পালটেছে। কতবার যে দিনের মধ্যে শাড়ি পালটায় পরমা।

ধৃতি বিছানায় চিতপাত হয়ে পড়েছিল। পরমা বিছানার ওপর এক টুকরো পিসবোর্ডে চায়ের কাপ রেখে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বলল, আজ নাইট শোতে সিনেমায় যাচ্ছি।

জয়কে খুব ধসাচ্ছ ভাই বন্ধুপত্নী।

আহা, সিনেমায় গেলে বুঝি ধসানো হয়?

শুধু সিনেমা? ফি হপ্তায় যে শাড়ি কিনছ। টি ভি কেনার বায়না ধরেছ। সব জানি। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলেও খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে প্রায়ই। পরমা তার প্রিয় মুদ্রাদোষে ঠোঁট উলটে বলে, আমরা তো আর আপনার মতো রসকষহীন হাড়কঞ্জুস নই।

আমি কঞ্জুস?

নয় তো কী? খরচের ভয়ে তো বিয়েই করছেন না। পাছে প্রেমিকাকে সিনেমা দেখাতে কি হোটেলে খাওয়াতে হয় সেই ভয়েই বোধহয় প্রেমেও অরুচি হচ্ছে।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে চায়ে চুমুক মেরে ধৃতি বলল, তোমাদের বিবাহিতদের যা কাণ্ড-কারখানা দেখছি এরপর আহাম্মক ছাড়া কে বিয়ে করতে যায়?

মারব থাপ্পড়, কী কাণ্ড দেখলেন শুনি?

রোজ তো তোমাদের দু'জনে খটামটি লেগে যায়।

আহা, সে হাঁড়ি-কলসি এক জায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি হয়ই। তা ছাড়া ওসব ছাড়া প্রেম জমে নাকি? একঘেয়ে হয়ে যায়।

যা-ই বলো ভাই, জয়টার জন্য আমার কষ্ট হয়।

পরমা থমথমে মুখ করে বলে, বললেন তো? আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি। একটা চিঠি এসেছে আপনার। নীল খামে। কিছুতেই সেটা দেব না।

মাইরি?— বলে ধৃতি উঠতে চেষ্টা করে।

পরমা লঘু পায়ে দরজা পেরিয়ে ছুটে চলে যায়। ধৃতি একটু উঠতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ওঠে না। চা খেতে থাকে আস্তে আস্তে।

হলঘরে জয়ের গলা পাওয়া যায়, ওঃ, যা একখানা কাণ্ড হয়ে গেল আজ! এই পরমা, শোনো না!

পরমা কোনওদিনই জয়ের ডাকে সাড়া দেয় না। স্বামীরা আজকালকার মেয়েদের কাছে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন। পরমা কোনও জবাব দিল না।

এই পরমা!— জয় ডাকে।

ভারী বিরক্তির গলায় পরমা বলে, অত চেঁচাচ্ছ কেন বলো তো! এখন যেতে পারছি না।

ডোন্ট শো মি বিজিনেস। কাম হিয়ার। গিভ মি এ—

আঃ! কী যে কোরো। দাঁড়াও, ধৃতিকে ডাকছি, এসে দেখে যাক।

ওঃ, ধৃতি দেখে কী করবে? হি ইজ ভারচুয়ালি সেক্সলেস। ওর কোনও রি-অ্যাকশন নেই।

পরমা চেঁচিয়ে ডাকল, ধৃতিবাবু! এই ধৃতি রায়!

ধৃতি শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ স্বরে ঘর থেকেই জবাব দেয়, ভাই, তোমাদের বসন্ত-উৎসবে আমাকে ডেকো না। আমি কোকিল নই, কাক।

পরমা পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বলে, একজন বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করা পুরুষের কর্তব্য। আপনাদের শিভালরি কোথায় গেল বলুন তো?

অগাধ জলে। পরমা, আমাদের সব ভেসে গেছে। নারী প্রগতির এই যুগে পুরুষ নাসবন্দি অপদার্থ মাত্র।

পরদার ওপাশে ঝটাপটির শব্দ হয়। আসলে ওটা জয়ের প্রেম নয়, টিকলিং। ধৃতি নির্বিকার ভাবে ধোঁয়ার রিং করার চেষ্টা করতে থাকে শুয়ে শুয়ে। সে জানে জয় সুব্রতর বোনের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করেছে সম্প্রতি। জানে বলে ধৃতির এক ধরনের নির্বিকার ভাব আসে। একটু বাদে জয় ঘরে এল। তার পরনে পাজামা, কাঁধে তোয়ালে। হাতে এক গ্লাস ফ্রিজের ঠান্ডা জল। এসে চেয়ারে বসে বলল, দিন দিন ডামি হয়ে যাচ্ছি মাইরি।

মানে?

মানে আর কী? কোথাও আমার কোনও ওপিনিয়ন অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে না। না ঘরে, না বাইরে। কোম্পানি আগ্রার কাছে তাদের প্রোডাকশন তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমাকে যেতে হবে সাইট আর আদার ফেসিলিটিজ দেখতে। এ নিয়ে আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দু' ঘণ্টা মুখের ফেকো তুলে

বকলাম। কী মাল মাইরি! আসানসোলে কারখানা খোলবার লেটার অফ ইনডেন্ট পেয়ে গেছে, তবু সেখানে করবে না, আগ্রায় যাবে। হেডস্ট্রং যাকে বলে!

কবে যাচ্ছিস?

ঠিক নেই এখনও। মে বি নেক্সট মান্থ, মে বি নেক্সট উইক, ইভন টুমোরো।

ঘুরে আয়। সেকেন্ড হানিমুন হয়ে যাবে।

আর হানিমুন! ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে লালবাতি জ্বলছে। এই ফ্ল্যাটটা না বেচে দিতে হয়। আজকাল যে যত বড় চাকরি করে তার তত মানিটারি ওবলিগেশন। হ্যাঁ রে, তোরা ট্যাকসেশন নিয়ে কি কিছুই লিখবি না? খোদ অ্যামেরিকায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টের বেশি ট্যাকসেশন নেই। আর এই ভুখা দেশে কেন এরকম আনহাইজনিক ট্যাকসেশন।

কে জানে!

এটা নিয়ে কিন্তু লেখা দরকার। একটা তিন হাজারি মাস মাইনের লোক আজকাল পুরো প্রলেটারিয়েট। আর ওদিকে যত ট্যাক্স রেট বাড়ছে তত বাড়ছে ট্যাক্স ক্রাইম আর হ্যাজার্ডস।

ধৃতি চিত থেকে উপুড় হয়ে বলল, তুই তো এই ফ্ল্যাটটা তোর কোম্পানিকে লিজ দিয়েছিস। তারাই তো ভাড়া গুনছে।

না করে কী করব? টাকা আসবে কোত্থেকে? আমার একমাত্র ট্যাক্স-ফ্রি ইনকাম কোনটা জানিস? তোর দেওয়া মাসে মাসে দুশো টাকা।

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। বাস্তবিকই বড় চাকুরেরা আজকাল সুখে নেই।

জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ, ঠান্ডা জল খেল।

ধৃতি বলল, তোর বউ আমার একটা চিঠি চুরি করেছে। মেয়েদের নিন্দে করেছিলাম বলে পানিশমেন্ট।

নিন্দে করেছিস? সর্বনাশ। সে তো সাপের লেজে পা।

ওপাশের হলঘর থেকে পরমা চেঁচিয়ে বলে, খবরদার সাপের সঙ্গে তুলনা দেবে না বলে দিচ্ছি। আমরা কি সাপ?

সাপ কি খারাপ?— জয় প্রশ্ন করে উঁচু স্বরে।

পরমা ঘরে ঢুকে আসে। হাতে এক কোষ জল। সেটা সজোরে জয়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, সাপ ভাল কি না নিজে জানো না?

ধৃতি বালিশে মুখ গুঁজে বলে, আচ্ছা বাবা, আমিই না হয় সাপ। জয় ভেড়া, আর পরমা সিংহী।

সিংহী না হাতি। পরমার সরোষ উত্তর।

তবে হাতিই। দ্যাট ইজ ফাইনাল।— ধৃতি বলে।

জয় হেসে বলে, হাতি বলছে কেন জানো তো! তোমার যে একটু ফ্যাট হয়েছে তাইতেই ওর চোখ টাটায়। ওর গায়ে এক মগ জল ঢেলে দাও।

পরমা 'ঠিক বলেছ' বলে দৌড়ে গেল জল আনতে।

জয় এক প্যাকেট আবদাল্লা সিগারেট ধৃতির বিছানায় ছুড়ে দিয়ে বলল, এটা তোর জন্য। রাখ।

ধৃতি পরম আলস্যে পাশ ফিরে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলে, কোথায় পেলি? ফরেনের মাল দেখছি।

অফিসে একজন ক্লায়েন্ট চার প্যাকেট প্রেজেন্ট করে গেল। সদ্য ফরেন থেকে এসেছে।

ধৃতি একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানে।

জয় বলে, একটু গার্ড নে, পরমা বোধহয় সত্যিই জল আনছে।

মাইরি!— বলে ধৃতি লাফিয়ে ওঠে।

পরমা একটা লাল প্লাস্টিকের মগ হাতে ঘরে ঢুকেই ছুটে আসে। ধৃতি জাপানি ছাতাটা খুলে সামনে ধরতেই পরমা হেসে উঠে বলে, আহা, কী বুদ্ধি!

বলতে বলতে পরমা মগ থেকে জল হাতের আঁজলায় তুলে ওপর বাগে ছিটিয়ে দেয়, নানা কায়দায় ধৃতি ছাতা এদিক ওদিক করে জল আটকাতে আটকাতে বলে, আমি কী করেছি বলো তো?

হাতি বললেন কেন?

মোটেই বলিনি। তুমি বলেছ।

ইস্! আপনিই বলেছেন।

মাপ চাইছি।

কান ধরুন।

ধৃতি ছাতা ফেলে কান ধরে দাঁড়ায়।

পরমা মগ রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, মেয়েদের সম্মান করতে কবে যে শিখবেন আপনারা!

কেন, খুব সম্মান করি তো।

করলে জাতটা উদ্ধার পেয়ে যেত।

জয় মৃদু হাসছিল। বলল, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না পরমা। ধৃতি এক নম্বরের উওম্যান-হেটার! নারী প্রগতির বিরোধী। আড়ালে ও মেয়েদের নামে যা তা বলে। ও যদি কখনও প্রাইম মিনিস্টার হয় তবে নাকি স্লোগান দেবে, মেয়েরা রান্নাঘরে ফিরে যাও।

বটে?— পরমা চোখ বড় করে তাকায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, মাইরি না। আমি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখতেও যাই।

পরমা শ্বাস ফেলে বলে, আমি অবশ্য মেয়েদের ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি না। কিন্তু মেয়েদের লিবার্টিকে সাপোর্ট করি।

তোমরা তো ভাই লিবারেটেড। কেউ আজকাল মেয়েদের বাঁধে না! ছাড়া মেয়েরা কেমন চারদিকে পাখি প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ফের? ছাড়া মেয়ে মানে?

মানে যারা লিবারেটেড।

সন্দেহের চোখে চেয়ে পরমা বলে, ব্যাড সেনসে বলছেন না তো?

আরে না।

জয় বলে, ব্যাড সেনসেই বলছে। ওকে ছেড়ো না।

পরমা জয়ের দিকে চেয়ে বলে, তুমি ফুট কাটছ কেন বলো তো?

আমাকে খেপিয়ে দিয়ে বিনি পয়সায় মজা দেখতে চাইছ?

ধৃতি কথাটা লুফে নিয়ে বলে, একজ্যাক্টলি। এবার জয়কেও একটু শাসন করো পরমা, বর বলে অতটা খাতির কোরো না।

কে খাতির করছে?— বলে ধৃতিকে একটা ধমক দিয়ে পরমা জয়কে বলে, আমি জোকার নাকি?

জয় খুব বিষণ্ণ হয়ে বলে, যার জন্য করি ভাল সে-ই বলে চোর!

থাক, আর সাধু সাজতে হবে না।

তুমি নারীরত্ন।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, ডিকশনারি কিংবা বঙ্কিমের বই খুললেই ওসব শব্দ জানা যায়। কমপ্লিমেন্ট দিতেও পারো না বুদ্ধু কোথাকার!

তোমার দিকে চাইলে আমার যে কথা হারিয়ে যায়। আত্মহারা হয়ে পড়ি।

খুব সন্তর্পণে ধৃতি বলল, পরমা সুন্দরী।

পরমা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এটা আবার কবে থেকে?

এইমাত্র মনে এল। ভাল না?

ভেবে দেখি।

বলছিলাম পরমা সুন্দরী, আজকের ডাকে আমার কি কোনও চিঠি এসেছে?

এসেছে, কিন্তু দেব না।

না না, চাইছি না, এলেই হল। আমার যে চিঠি আসছে তার মানে হল এখনও লোকে আমাকে ভুলে যাচ্ছে না, আমি যে বেঁচে আছি তা এখনও কিছু লোক জানে, আর কষ্ট করে যে চিঠি লিখছে তার অর্থ হল আমার মতো অপদার্থকেও লোকের কিছু জানানোর আছে, বুঝলে? চিঠি আসাটাই ইম্পর্ট্যান্ট। চিঠিটা নয়।

ওঃ, খুব ফিলজফার। আচ্ছা দেব না চিঠি।

চাইনি তো। চাইছিও না।— ধৃতি বলে।

চাইছে না আবার! ভিতরে ভিতরে ছটফটাচ্ছে! কে চিঠি দিয়েছে বলুন তো? মেয়েলি হাতের লেখা আমি ঠিক চিনি।

হয়তো দিদি।— ধৃতি বলে।

না, দিদি নয়, খামের বাঁ দিকে চিঠি যে দিয়েছে তার নাম-ঠিকানা আছে।

তাই বলো!— ধৃতি একগাল হেসে বলে, আমি ভাবছি, পরমার এত বুদ্ধি কবে থেকে হল যে হাতের লেখা দেখে মেয়ে না ছেলে বুঝে ফেলবে!

শুনলে পরমা?— জয় ফের খোঁচায়।

পরমা বলে, আমি কালা নই।

তোমাকে বোকা বলছে।

বোকা নয়।— ধৃতি বলে, আমি বলতে চাইছি পরমা কুটিল নয়, পরমা সরল ও নিষ্পাপ।

হয়েছে! এই নিন চিঠি। আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

বিছানার ওপর একটা খাম ফেলে দিয়ে পরমা চলে যায়।

ধৃতি ঘড়ি দেখে। সময় আছে। চিঠিটা নিয়ে বিছানায় ফের চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

খামের ওপর বাঁ-ধারে লেখা, টুম্পা চৌধুরী। নামের নীচে মধ্য কলকাতার ঠিকানা।

ধৃতি টুম্পা নামে কাউকে মনে করতে পারল না। চিঠি বেশি বড়ও নয়। খুলে দেখল কয়েক ছত্র লেখা— শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার দাদা আপনার সঙ্গে পড়ত। দাদার নাম অশোক চৌধুরী। মনে আছে? একটা দরকারে এই চিঠি লিখছি। আমি একটা ডেফিসিট গ্র্যান্টের স্কুলে কাজ করি। আমাদের বিল্ডিং-এর জন্য একটা গ্র্যান্ট দরকার। আমরা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু ধরা-করা ছাড়া তো এসব হয় না। আপনার সঙ্গে তো মিনিস্টারের জানাশোনা আছে। আমি সামনের সপ্তাহে আপনার অফিসে বা বাসায় গিয়ে দেখা করব। প্রণাম জানবেন।—টুম্পা চৌধুরী।

টুম্পা মেয়েটা দেখতে কেমন হবে তা ভাবতে ভাবতে ধৃতি উঠে পোশাক পরতে থাকে। জয় চেয়ারে বসে থেকে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে।

ধৃতি মেয়েদের অপছন্দ করে না। তবে কিনা তার কিছু বাছাবাছি আছে। মেয়ে মাত্রই তাকে আকর্ষণ করে না। এই যেমন পরমা। এত অসহনীয় সুন্দরী, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব-সাব তবু পরমার প্রতি কখনও দুর্বলতা বোধ করে না ধৃতি। অর্থাৎ পরমার চেহারা বা স্বভাবে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যা ধৃতির কাছে ওকে কাম্য করে তোলেনি।

এসব বলার মতো কথা নয়। শুধু মনের মধ্যেই এসব কথা চিরকাল থেকে যায়। পরমা বন্ধুপত্নী এবং পরস্ত্রী। কাজেই কোনও রকমেই কাম্য নয়। কিন্তু সে হল বাইরের সামাজিক ব্যাপার। মানুষের

মনের মধ্যে তো সমাজ নেই। সেখানে যে রাষ্ট্রের শাসন সেখানে নীতি নিয়ম নেই, অনুশাসন নেই, আছে কেবল মোটা দাগের কামনা, বাসনা, লোভ, ভয়।

২

টুপুর ছবি দেখলেন? কেমন? সুন্দরী নয়? টুপু ছিল মিস এলাহাবাদ। টুপুর কথা আপনাকে কিন্তু লিখতেই হবে।

বিশাল চিঠি। তাতে টুপুর খুন হওয়ার নানা সম্ভব ও অসম্ভব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। টুপু ছিল নিষ্পাপ, পবিত্র, স্বর্গীয় একটি মেয়ে।

চিঠিটা রেখে ধৃতি বরং ফোটোটাই দেখে। মিথ্যে নয় যে মেয়েটি সুন্দরী। এবং মিস এলাহাবাদ হলেও কোনও আপত্তির কারণ নেই। লম্বাটে ছাঁদের মুখ, বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে কথা ফুটে আছে। কী অসম্ভব সুন্দর টসটসে ঠোঁট দু'খানা! অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাশ থেকে অমিত উঁকি দিয়ে বলে, আরে! কার ছবি দেখছেন? দেখি দেখি!

ধৃতি ছবিটা অমিতের হাতে দিয়ে বলে, পাত্রীর মা ছবিটা পাঠিয়েছে।

বেশ দেখতে। একে বিয়ে করুন।

ধৃতি হেসে চলে, বিয়ে করা শক্ত।

কেন?

মেয়েটা এখন অনেক দূরে। সেখানে জ্যান্ত যাওয়া যায় না।

মরে গেছে?

তাই তো জানিয়েছে।

তবে যে বললেন পাত্রী।

পাত্রী মানে কি বিয়ের পাত্রী? পাত্রীর অর্থ এখানে একটি ঘটনার পাত্রী। মেয়েটা খুন হয়েছে।

ওঃ! দেখতে ভারী ভাল ছিল মেয়েটা!

ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, কিন্তু পাস্ট টেনস।

আপনাকে ছবি পাঠিয়েছে কেন?

কত পাগল আছে।

নিউজ এডিটর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত পায়ে চলে যেতে যেতেও হঠাৎ থমকে ধৃতির সামনে ঘুরে এসে বললেন, এ সপ্তাহে আপনার ইভনিং শিফট চলছে তো?

হ্যাঁ।

কালকের মধ্যে একটা ফিচার লিখে দিতে পারবেন?

কী নিয়ে?

ম্যারেজ ল অ্যামেন্ডমেন্ট।

লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে?

আরে না, না। তাহলে আপনাকে বলা হত না। আপনি শুধু সোস্যাল ইমপ্যাক্টটার ওপর লিখবেন। কিন্তু কাল চাই।

ধৃতি মাথা নাড়ল।

এখন ইমারজেনসি চলছে। খবরের ওপর কড়া সেনসর। বস্তুত দেওয়ার মতো কোনও খবর নেই। তাই এত ফিচারের তাগিদ। টেলিপ্রিন্টারে যাও বা খবর আসে তার অর্ধেক যায় সেনসরে। ট্রেনে ডাকাতি হওয়ার খবরটাও নিজের ইচ্ছেয় ছাপা যায় না।

ধৃতি উঠে লাইব্রেরিতে চলে আসে। লাইব্রেরিয়ান অতি সুপুরুষ জয়ন্ত সেন। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে, দেখলে ত্রিশও মনে হয় না। চমৎকার গোছানো মানুষ। লাইব্রেরিটা ঝকঝক তকতক করছে।

জয়ন্ত গম্ভীর মানুষ, চট করে কথা বলেন না, একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে একটা মস্ত পুরনো বই দেখতে থাকেন।

ধৃতি উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলে, দাদা, ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট ল নিয়ে লিখতে হবে।

জয়ন্ত এবার মৃদু একটু হাসলেন। বই থেকে মুখ তুলে বললেন, ফিচার?

হ্যাঁ।

জয়ন্ত মস্ত টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলেন, হাতটা দেখি।

জয়ন্তর ওই এক বাতিক। হাত দেখা আর কোষ্ঠী বিচার। গত শীতে কলকাতা আর ব্যাঙ্গালোর টেস্ট ম্যাচের ফলাফল আশ্চর্যজনক নিখুঁত বলে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা দারুণ কথা বলে দেন। রিপোর্টার সুশীল সান্যালকে গত বছর জুন মাসে হঠাৎ একদিন ডেকে বললেন, কিছু টাকা-পয়সা হাতে রাখো। তোমার দরকার হবে। আর এই হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছ, ফুর্তি লুটছ, তাও কিছুদিন বন্ধ। চুপটি করে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক তাই হয়েছিল। সুশীলবাবুর পেটে টিউমার ধরা পড়ল পরের মাসে। অপারেশনের পর পাক্কা তিন মাস বিছানায় শোওয়া। টাকা গেল জলের মতো। জয়ন্ত সেনকে তাই সবাই কিছু খাতির করে। এমনিতে মানুষটি বেশি কথা বলেন না বটে কিন্তু বাতিক চাড়া দিলে অ্যাসট্রোলজি নিয়ে অনেক কথা বলতে পারেন।

ধৃতির হাতটা দেখে তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, কোষ্ঠী আছে?

ছিল। এখন নেই।

হারিয়ে ফেলেছেন?

আমার কিছু থাকে না। আমি হলাম নাগা সাধু। ভূত-ভবিষ্যৎও নেই।

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, হাতের রেখা তো তা বলছে না।

কী বলছে তবে?

ভূত ছিল, ভবিষ্যৎও আছে।

ধৃতি একটু নড়ে বসে বলে, কী রকম?

জয়ন্ত হাতটা ছেড়ে নির্বিকার ভাবে বললেন, দুম করে কি বলা যায়। তবে খুব ইন্টারেস্টিং হাত।

ধৃতি কায়দাটা বুঝতে পারে। খুব আগ্রহ নিয়ে হাতটা দেখে একটু রহস্য জাগানো কথা বলেই যে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন ওর পিছনে ছোট একটি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে। ধৃতি যে হাত দেখায় বিশ্বাসী নয় তা বুঝে তিনি ওই চাল দিলেন। দেখতে চাইছেন এবার ধৃতি নিজেই আগ্রহ দেখায় কি না।

ধৃতি আগ্রহ দেখায় না। আবার বলে, কিন্তু আমার ল-এর কি হবে?

হবে। আমার কাছে কাটিং আছে।— বলে জয়ন্ত আবার মৃদু হেসে যোগ করলেন, কেবল আমার কাছেই সব থাকে।

সেটা জানি বলেই তো আসা।

কলিং-বেলে বেয়ারা ডেকে কাটিং বের করে দিতে বললেন জয়ন্ত।

রিডিং-এর ফাঁকা টেবিলে বসে বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিং থেকে ধৃতি অ্যামেন্ডমেন্ট ল সম্পর্কে তথ্য টুকে নিচ্ছিল প্যাডে। এসব অবশ্য খুব কাজে লাগবে না। তাকে ঘুরে ঘুরে কিছু মতামত নিতে হবে। সাক্ষাৎকার না হলে ব্যাপারটা সুপাঠ্য হবে না। আইন শুকনো জিনিস, কিন্তু মানুষ কেবল আইন মানা জীব নয়।

নতুন সংশোধিত আইনে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে ভারী সহজলভ্য। মামলা করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেপারেশন পাওয়া যাবে। আগে আইন ছিল, ডিভোর্সের পর কেউ এক বছর বিয়ে করতে পারবে না, নতুন আইনে সে সময় কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হচ্ছে। এসব ভাল না মন্দ তা ধৃতি জানে না। ডিভোর্স সহজলভ্য হলে কী হয় তা সে বোঝে না। তবে এটা বোঝে যে ডিভোর্সের কথা মনে রেখে কেউ বিয়ে করে না।

জয়ন্ত উঠে বাইরে যাচ্ছিলেন। টেবিলের সামনে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বললেন, পেয়েছেন সবকিছু?

ধৃতি মুখ তুলে হেসে বললে, এভরিথিং।

চলুন চা খেয়ে আসি। ফিরে এসে লিখবেন।

ধৃতি উঠে পড়ে। শিফটে এখনও কাজ তেমন শুরু হয়নি। সন্ধের আগে বড় খবর তেমন কিছু আসে না। তাছাড়া খবরও নেই। প্রতিদিনই ব্যানার করবার মতো খবরের অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। আজ কোনটা লিড হেডিং হবে সেটা প্রতিদিন মাথা ঘামিয়ে বের করতে হয়। সারাদিন টেলিপ্রিন্টার আর টেলেক্স বর্ণহীন গন্ধহীন জোলো খবরের রাশি উগরে দিচ্ছে। কাজেই খবর লিখবার জন্য এক্ষুনি তাকে ডেস্কে যেতে হবে না।

ধৃতি ক্যান্টিনের দিকে জয়ন্তর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে, আপনি মানুষের মুখ দেখে কিছু বলতে পারেন?

জয়ন্ত বলেন, মুখ দেখে অনেকে বলে শুনেছি। আমি তেমন কিছু পারি না। তবে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে না পারলেও ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু বলা যায়।

ফোটো দেখে বলতে পারেন?

ফোটো প্রাণহীন বস্তু, তবু তা থেকেও আন্দাজ করা সম্ভব। কেন বলুন তো?

ক্যান্টিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসার পর ধৃতি হঠাৎ খুব কিছু না ভেবে-চিন্তে টুপুর ফোটোটা বের করে জয়ন্তকে দেখিয়ে বলে, বলুন তো কেমন মেয়ে?

জয়ন্ত চায়ে চুমুক দিয়ে ফোটোটা হাতে নিয়ে বলেন, তাই বলুন। এতদিনে তাহলে বিয়ের ফুল ফুটতে যাচ্ছে! তবে ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যাপার হলে ফোটোর চেয়ে কোষ্ঠী অনেক সেফ। মেয়েটার কোষ্ঠী নেই?

ধৃতি ঠোঁট উলটে বলে, মেয়েটিই নেই।

সে কী!— বলে জয়ন্ত ছবিটা আর একবার দেখে ধৃতির দিকে তাকিয়ে বলেন, তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক জেনে কী হবে? মারা গেছে কবে?

তা জানি না। তবে বলতে পারি খুন হয়েছে।

খুন! ও বাবাঃ, পুলিশ কেস তাহলে!— বলে জয়ন্ত ছবিটা ফেরত দিতে হাত বাড়িয়ে বললেন, তাহলে আর কিছু বলার নেই।

আছে।— ধৃতি বলে, ধরুন, মেয়েটার চরিত্রে এমন কী আছে যাতে খুন হতে পারে, তা ছবি থেকে আন্দাজ করা যায় না?

জয়ন্ত গম্ভীর চোখে চেয়ে বলেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

কেউ না।

পরিচিতা তো। প্রেম-ট্রেম ছিল নাকি?

আরে না দাদা, চিনতামই না।

তবে অত ইন্টারেস্ট কেন? পুলিশ যা করবার করবে।

পুলিশ তার কাজ করবে। আমার ইন্টারেস্ট মেয়েটির জন্য নয়।

তবে?

অ্যাসট্রোলজির জন্য।

ছবিটা আবার নিয়ে জয়ন্ত তাঁর প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পকেট থেকে বের করে চোখে আঁটলেন। তাতেও হল না। একটা খুদে আতস কাচ বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ছবিটা। চা ঠান্ডা হয়ে গেল। প্রায় আট-দশ মিনিট বাদে জয়ন্ত আতস কাচ আর চশমা রেখে ছবিটা দু' আঙুলে ধরে নাড়তে নাড়তে চিন্তিত মুখে প্রশ্নটা করলেন, মেয়েটা খুন হয়েছে কে বলল?

ওর মা।

তিনি আপনার কে হন?

কেউ না। চিনিই না। একটা ফোন-কলে প্রথম খবর পাই। আজ একটা চিঠিও এসেছে। দেখুন না।— বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দেয়।

জয়ন্ত খুব আলগা ভাবে চিঠিটা পড়লেন না। পড়লেন খুব মন দিয়ে। অনেক সময় নিয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট চলে গেল।

তারপর মুখ তুলে বললেন, আমি মুখ দেখে তেমন কিছু বলতে পারি না বটে, কিন্তু আমার একটা ফিলিং হচ্ছে যে মেয়েটা মরেনি।

বলেন কী?

জয়ন্ত আবার চা আনালেন। গম্ভীর মুখে বসে চা খেতে খেতে চিন্তা করে বললেন, আপনি জ্যোতিষবিদ্যা মানেন না?

না। মানে, তেমন মানি না।

বুঝেছি। কিন্তু মানেন না কেন? যেহেতু সেকেন্ডহ্যান্ড নলেজ তাই না?

তাই।

তবে আপনাকে যুক্তিবাদী বলতে হয়। না?

হ্যাঁ।

কিন্তু আসলে আপনি যুক্তিবাদী নন, আপনার মনন বৈজ্ঞানিক সুলভ নয়।

কেন?

একটা ফোন-কল, একটা চিঠি আর একটা ফোটো— মাত্র এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে আপনি কী করে বিশ্বাস করছেন যে মেয়েটা খুন হয়েছে?

তবে কি হয়নি?

না। আমার মন বলছে শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ।

কী করে বললেন?

বলছি তো আমার ধারণা।

কোনও লজিক্যাল বেস নেই ধারণাটার?

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললেন, আপনি আচ্ছা লোক মশাই। মেয়েটা যে মরে গেছে, আপনার সে ধারণাটারও তো কোনও লজিক্যাল বেস নেই। আপনাকে একজন জানিয়েছে যে টুপু মারা গেছে বা খুন হয়েছে। আপনি সেটাই ধ্রুব বলে বিশ্বাস করছেন।

জয়ন্ত সেন ছবিটার দিকে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আপন মনে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, খুব সেনসিটিভ, অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল, মনের শক্তি বেশ কম, অন্যের দ্বারা চালিত হতে ভালবাসে।

কে?— ধৃতি চমকে প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত ছবিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে, আপনার টুপু সুন্দরী।

আমার হতে যাবে কেন?

দেখি আপনার হাতটা আর একটু।— বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ধৃতির ডান হাতটা টেনে নিলেন।

ফোটোগ্রাফার সৌরীন এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি খেয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে টেবিলের ধারে এসে বলে, আমার হাতটা দেখবেন না জয়ন্তদা?

পরে।— জয়ন্তর গম্ভীর উত্তর।

অনেকদিন ধরে ঝোলাচ্ছেন। ধৃতিবাবু, কী খবর?

ভাল।

সৌরীন হঠাৎ ঝুঁকে ছবিটা দেখে বলে, বাঃ, দারুণ ছবিটা তুলেছে তো! ফোটোগ্রাফার কে?

ধৃতি হাসল। সৌরীন পেশাদার ফোটোগ্রাফার, তাই মেয়েটার চেয়ে ফোটোর সৌন্দর্যই তার কাছে বেশি গুরুতর।

ধৃতি বলে, মেয়েটা কেমন?

ভাল।— সৌরীন বলে, তবে ফ্রন্ট ফেস যতটা ভাল প্রোফাইল ততটা ভাল কি না কে জানে। মেয়েটা কে?

চিনবেন না।— ধৃতি বলল।

সৌরীন চলে গেলে জয়ন্ত ধৃতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, হুঁ।

হুঁ মানে?

মানে অনেক ব্যাপার আছে। আপনার বয়স এখন কত?

উনত্রিশ বোধহয়। কম বেশি হতে পারে।

একটা ট্র্যানজিশন আসছে।

কী রকম?

তা হুট করে বলি কেমন করে?

কবে?

শিগগিরই।

ধৃতি অবশ্য এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। সারা জীবনে সে কখনও ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। যা কিছু হয়েছে বা করেছে সে, তা সবই নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে।

ধৃতি বলল, খারাপ নয় তো?

হয়তো খারাপ। হয়তো ভাল।

ধৃতি হাসল। বলল, এবার আসুন ডিম খাই। আমি খাওয়াচ্ছি।

দু'জনে ওমলেট খেতে লাগল। খেতে খেতে ধৃতি বলে, জয়ন্তদা, আপনি টুপুর কেসটা যত সিরিয়াসলি দেখছেন ততটা কিছু নয়।

তাই নাকি?— নিস্পৃহ জবাব জয়ন্তর।

ওর মা চাইছে খবরটা কাগজে বেরোক।

খবরদার বের করবেন না।

আরে মশাই, আমি ইচ্ছে করলেই কি বের করতে পারব নাকি? কাগজ তো আমার ইচ্ছেয় হাবিজাবি খবর ছাপাবে না।

তা হলেও আপনি কোনও ইনিশিয়েটিভ নেবেন না। মেয়েটার মা ফোনে আপনাকে কী বলেছিল?

এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল করেছিল। রাত তখন দুটো-আড়াইটে। শুধু বলছিল টুপুকে খুন করা হয়েছে, আপনি খবরটা ছাপবেন।

চিঠিটা কবে এল?

আজ।

দেখি।— বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর চিঠি ফেরত দিয়ে জয়ন্ত হেসে বললেন, আপনি মশাই দিনকানা লোক।

কেন?

চিঠিটা ভাল করে দেখেছেন?

দেখেছি তো।

কিছুই দেখেননি। চিঠির ওপর এলাহাবাদের ডেটলাইন। কিন্তু খামের ওপর কলকাতা উনত্রিশ ডাকঘরের শিলমোহর, সেটা লক্ষ করেছেন?

ধৃতি একটা চমক খেয়ে তাড়াতাড়ি খামটা দেখে। খুবই স্পষ্ট ছাপ। ভুল নেই।

ধৃতি বলে, তাই তো!

জয়ন্ত বলেন, এবার টেলিফোনটার কথা বলুন তো।

সেটা এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককলই ছিল।

কী করে বুঝলেন?

অপারেটার বলল যে।

অপারেটারের গলা আপনি চেনেন?

না।

তবে?

তবে কী?

অপারেটার সেজে যে-কেউ ফোনে বলতে পারে এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককলে আপনাকে ডাকা হচ্ছে। অফিসের অপারেটারও সেটা ধরতে পারবে না।

সেটা ঠিক।

আমার সন্দেহ সেই ফোন-কলটা কলকাতা থেকেই এসেছিল।

ধৃতি হঠাৎ হেসে উঠে বলে, কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছিল বলছেন?

জোক কি না জানি না, তবে প্র্যাক্টিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ। আপনি তো ভোঁতা মানুষ নন, তবে মিসলেড হলেন কী করে? এবার থেকে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলবেন।

ধৃতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ফের।

৩

ধৃতি মদের ভক্ত নয়। কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদ খেলেই তার নানারকম শারীরিক অসুবিধে হতে থাকে। কখনও আধকপালে মাথা ধরা, কখনও পেটে প্রচণ্ড গ্যাস জমে, কখনও দমফোট হয়ে হাঁসফাঁস লাগে। কাজেই পারতপক্ষে সে মদ ছোঁয় না।

অফিস থেকে আজ একটু আগে আগে কেটে পড়ার তালে ছিল সে। ছ'টায় ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে গ্যারি কুপারের একটা ফিল্ম দেখাবে। ধৃতি কার্ড পায়। প্রায়ই ছবি দেখা তার হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ ছবিটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তার।

আজ চিফ সাব-এডিটার তারাপদবাবু কাজে বসেছেন। বয়স্ক লোক এবং প্রচণ্ড কাজপাগল। কোন খবরের কতটা ওজন তা তাঁর মতো কেউ বোঝে না।

ধৃতি গিয়ে বলল, তারাপদদা, আজ একটু আগে আগে চলে যাব।

যাবে?— বলে তারাপদবাবু মুখ তুলে একটু হেসে ফের বললেন, তোমার আর কী? কর্তারা ফিচার লেখাচ্ছেন তোমাকে দিয়ে। তুমি হলে যাকে বলে ইম্পর্ট্যান্ট লোক।

এটা অবশ্য ঠেস-দেওয়া কথা। কিন্তু তারাপদবাবুর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ বড় একটা নেই। ভালমানুষ রসিক লোক। তাই কথাটার মধ্যে বিষ নেই।

ধৃতি হেসে বলে, ইম্পর্ট্যান্ট নয় তারাদা, আমি হচ্ছি আসলে ইম্পোটেন্ট।

তারাপদবাবু মুখখানা খুব বোজো মানুষের মতো গম্ভীর করে পিন আঁটা একটা মোটাসোটা খবরের কপি ধৃতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এ খবরটা করে দিয়ে চলে যাও। এটা কাল লিড হতে পারে। বেশি বড় কোরো না।

ঘড়িতে চারটে বাজে। কপি লিখতে ধৃতির আধঘণ্টার বেশি লাগবে না। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধৃতি নিজের টেবিলে কপিটা চাপা দিয়ে রেখে সিনেমার ডিপার্টমেন্টে আড্ডা মারতে গেল।

কালীবাবু চুলে কলপ দিয়ে থাকেন। চেহারাখানা জমিদার-জমিদার ধরনের। ভারী শৌখিন লোক। এক সময়ে সিনেমায় নেমেছিলেন, পরে কিছুদিন ডিরেকশন দিলেন। তিন-চারটে ছবি ফ্লপ করার পর হলেন সিনেমার সাংবাদিক। এখন এ পত্রিকার সিনেমার পাতা এডিট করেন।

ধৃতিকে দেখে বলেন, কী ভায়া, হাতে নাকি একটা ভাল মেয়েছেলে আছে! থাকলে দাও না, সিনেমায় নামিয়ে দিই। বাংলা ছবিতে নায়িকার দুর্ভিক্ষ চলছে দেখছ তো!

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, ভাল মেয়ে। আমার হাতে কোত্থেকে মেয়ে থাকবে কালীদা?

কেন, এই তো সৌরীন বলছিল তুমি নাকি একটা ঘ্যাম মেয়েছেলের ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ!

ওঃ!— বলে ধৃতি বসে।

দাও না মেয়েটার ঠিকানা। তোমার রিলেটিভ হলেও ক্ষতি নেই। আজকাল লাইন অনেক পরিষ্কার, কারও চরিত্র নষ্ট হয় না।

সেজন্য নয়। অন্য অসুবিধে আছে।

কেন লেজে খেলাচ্ছ ভাই?

সৌরীন কিছু জানে না। শুধু ছবিটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে এসে আপনাকে বলেছে।

অসুবিধেটা কী?

যতদূর শুনছি মেয়েটা বেঁচে নেই।

ধৃতি দ্বিধায় পড়ে যায়। জয়ন্ত সেন বার বার বলেছিলেন, শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ। সে কথাটা মনে পড়ে যায়।

ধৃতি বলল, ঠিক চিনি না। তবে জানি। মরার খবরটা অবশ্য উড়ো খবর।

কালীবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, সুন্দরী মেয়েরা মরবে কেন?

সেটাই তো প্রবলেম।

মোটেই কাজটা ভাল নয়। সুন্দরী মেয়েদের মরা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে বলে, এ মেয়েটাকে নিয়ে একটি মিস্ট্রি দেখা দিয়েছে। জয়ন্তদা ছবিটা দেখে বললেন, মেয়েটা নাকি মরেনি। অথচ আমার কাছে খবর আছে—

দেখি ছবিটা। আছে?— বলে হাত বাড়ায় কালীবাবু।

ছবিটা আজকাল ধৃতির সঙ্গেই থাকে। কেন থাকে তা বলা মুশকিল। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে ধৃতি এই ছবিটার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সব সময়ে তার মনে হয় এ ছবিটা খুব মারাত্মক একটা দলিল। কালীবাবু ছবিটা নিয়ে দেখলেন। সিনেমা লাইনের অভ্যস্ত প্রবীণ চোখ। উলটে-পালটে দেখে ছবিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে বলেন, মেয়েটার নাম-ঠিকানা দিতে পারো?

নাম টুপু। ঠিকানা মুখস্থ নেই, তবে আছে বাড়িতে। এলাহাবাদের মেয়ে।

ও। একটু দূর হয়ে গেল, নইলে আজই বাড়িতে হানা দিতাম গিয়ে।

কেমন বুঝছেন ছবিটা?

খুব ভাল। তবে সিঙ্গল ফোটোগ্রাফ নয়।

তার মানে?

মানে এটা একটি জোড়ার ছবি। এর পাশে আর কেউ ছিল। কিন্তু নেগেটিভ থেকে আলাদা করে শুধু মেয়েটার ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে।

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলেন?

কালীবাবু হেসে বলেন, যা বলছি তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বলে ধরে নিতে পারো। ছবিটা আবার ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ধৃতি ছবিটা ফের নেয়। এ পর্যন্ত অসংখ্য বার দেখেছে তবু বুঝতে পারেনি তো।

কালীবাবু বুঝিয়ে দেন, এই ডান পাশে মেয়েটার হাত ঘেঁষে একটু সাদা জমি দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ। ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড।

তোমার মাথা।

তবে কী ওটা?

ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে লাইট অ্যাশ কালার, এই সাদাটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা। ভাল করে দ্যাখো, দেখছ?

হ্যাঁ।

মানুষের কাঁধের ঢালু বুঝতে পারো না? সাদার ওপর অংশটা একটু বেঁকে গেছে দেখছ?

হ্যাঁ।

অর্থাৎ মেয়েটির পাশে সাদা বা লাইট রঙের কোনও জামা পরা এক রোমিও ছিল। এ ছবিটায় তাকে বাদ রাখা হয়েছে। মেয়েটাকে তুমি একদম চেনো না?

না।

তবে এ ছবিটা এল কোথা থেকে?

এল।

খোঁজ নাও। এ মেয়েটা ফিল্মে এলে হইচই পড়ে যাবে।

খোঁজ নিতে তো এলাহাবাদ যেতে হয়!

যাবে। আমি ফিনান্স করব।

ধৃতির ফের মনে পড়ে, চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসেনি, এসেছে কলকাতা থেকে। মনে পড়ে, জয়ন্ত সেন বলেছিলেন, ট্রাঙ্ককলটা স্রেফ ধোঁকাবাজি হতে পারে।

ধৃতি নড়ে চড়ে বসে বলে, আচ্ছা কালীদা, আপনার কি মনে হয় মেয়েটা বেঁচে আছে?

কালীবাবু ছবিটা ফের দেখছিলেন হাতে নিয়ে। পুরু চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চেয়ে বললেন, থাকাই উচিত। মরবে কেন হে?

ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেন? মানে কোনও ফিলিং হয়?

খুব হয়? একটাই ফিলিং হয়।— বলে কালীবাবু বদমাশের মতো হেসে বলেন, সেক্স জেগে ওঠে।

দূর! কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় না?

তুমি একটা বুদ্ধু। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে আনক্যানি ফিলিং হতে যাবে কোন দুঃখে?

যাই, কপি পড়ে আছে।— বলে ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল।

আরে বসো বসো। চা খাও। রাগ করলে নাকি? আমি আবার একটু পষ্ট কথা বলি তো?— বলে কালীবাবু ধৃতিকে বসিয়ে টেলিফোনে ক্যান্টিনকে চা পাঠাতে বলেন।

ধৃতি সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে বলে, আপনারা আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললেন দেখছি।

কী রকম?

আমাকে মেয়েটার মা জানিয়েছিল যে, টুপু মরে গেছে। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর জয়ন্তবাবু ছবিটা দেখে বললেন তাঁর মনে হচ্ছে যে মেয়েটা বেঁচে আছে।

বটে!

তাঁর কথা উড়িয়েও দিতে পারছি না। তার কারণ হল চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসার কথা, কিন্তু এসেছে কলকাতা থেকে।

ভারী রহস্যময় ব্যাপার তো।

আরও রহস্য হল যে আপনি আবার মেয়েটার পাশে এক অদৃশ্য রোমিওকে আবিষ্কার করলেন। তার মানে আরও জট পাকাল। মেয়েটার মা চেয়েছিল আমি মৃত্যু-সংবাদটা কাগজে বের করে দিই।

খবরদার ওসব কোরো না।

কেন?

সুন্দরীরা মরে না। তারা অমর। স্ত্রীলিঙ্গে বোধহয় অমরা বা অমরী কিছু একটা হবে।

সে যাই হোক, খবর বের করার এক্তিয়ার আমার নেই। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমি বেশ ফাঁপড়ে পড়ে যাচ্ছি ক্রমে।

ফাঁপরের কী আছে? খোঁজ নাও। তবে পুলিশ কেস হলে গা বাঁচিয়ে সরে এসো। ছবিটার মধ্যে একটু বদ গন্ধ আছে।

তার অর্থ?

অর্থাৎ মেয়েটা খুব ইনোসেন্ট নয়। চোখ-মুখ যত সুন্দরই হোক, এর মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট দুষ্টুমি আছে। অ্যাডভেনচারাস টাইপ। পাশের ছোকরাটিকে দেখতে পেলে হত। যাক গে, তুমি গা বাঁচিয়ে চলবে।

ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল। কালীবাবু হাত তুলে থামিয়ে ফের বললেন, সিনেমায় নামাটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। ভেবো না যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি তাকে সিনেমায় নামাবার জন্য পাগল হই।

বুঝলাম।

কালীবাবু একটু হেসে বলেন, আসলে জয়ন্তই আমাকে ব্যাপারটা বলছিল গতকাল। তখন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে একটু ওয়ার্নিং দিই।

ওয়ার্নিং কেন?

তুমি কাঁচা বয়সের ছেলে, কোথায় কোন ঘুণচক্করে পড়ে যাবে। মেয়েছেলে জাতটা যখন ভাল থাকে ভাল, যখন খারাপ হয় তখন হাড়বজ্জাত।

তাই বলুন। জানতেন।

জানতাম। আর এও বলি যে টুপুর মা ফের তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

তা করবে।

তুমি একটু রসের কথা-টথা বোলো। সিমপ্যাথি দেখাবে খুব। যদি দেখা করতে চায় তো রাজি হয়ে যেয়ো।

আচ্ছা।

ধৃতি উঠল।

বুধবার জয় গেল দিল্লি। স্বভাবতই একা বাড়িতে ধৃতি আর পরমার থাকা সম্ভব নয়। ধৃতির যাওয়ার জায়গা নেই তেমন। পরমার আছে। তাই পরমা গেল বাপের বাড়ি। সেই সঙ্গে ছুঁড়ি ঝিটাকেও নিয়ে গেল। গোটা ফ্ল্যাটে ধৃতি একা।

অবশ্য ধৃতি আর কতটুকুই বা ফ্ল্যাটে থাকে! তার আছে অফিস, আড্ডা, ফিচার লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়ানো। রাতে নাইট ডিউটি নেই বলে শুধু সেই সময়টুকু সে ফ্ল্যাটে থাকে।

রাত ন'টা নাগাদ ধৃতি অফিসে একটা বড় পলিটিক্যাল কপি লেখা শেষ করল। খুব পরিশ্রম গেছে। এইবার ছুটি। চলে যাওয়ার আগে সে এর ওর তার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে রোজই। আজ বুড়ো ডেপুটি নিউজ এডিটার মদনবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল।

ঠিক এইসময়ে চিফ সাব-এডিটার ডেকে বললেন, তোমার ফোন হে!

ধৃতি 'হ্যালো' শুনেই কেঁপে ওঠে একটু। টুপুর মা।

বলুন।— ধৃতি বলে।

চিঠি তো পেয়েছেন!

পেয়েছি!

ছবিটা দেখলেন?

হুঁ।

কেমন?

টুপু খুবই সুন্দরী।

আপনাকে তো বলেইছিলাম যে টুপুকে সবাই মিস এলাহাবাদ বলত। আমার টুপু ছিল সাংঘাতিক সুন্দরী।

হুঁ।

খবরটা কবে ছাপা হবে?

ধৃতি একটু ইতস্তত করে বলে, দেখুন এসব খবর ছাপার এক্তিয়ার তো আমাদের নেই।

আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

না পারি না।

দোহাই! প্লিজ! আমার টুপু আপনাদের কাছে কিছুই না জানি। কিন্তু ওর খবরটা ছাপা হলে আমি বড় শান্তি পাব। মায়ের ব্যথা তো বোঝেন না আপনারা!

শুনুন। প্রথম কথা, টুপু যদি নামকরা কেউ হত তবে খবরটা ছাপা সহজ হয়ে যেত। যদি খুনের কেস আদালতে উঠত তাও অসুবিধে হত না। কিন্তু শুধু অ্যাসাম্পশনের ওপর তো আমরা কিছু করতে পারি না।

দু'-চার লাইনও নয়?

না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরটা ছাপতে পারেন। কিন্তু তাতে খুনের উল্লেখ থাকলে চলবে না।

কিন্তু আমি যে সবাইকে টুপুর খুনের খবরটাই জানাতে চাই।

তাহলে আপনি পুলিশের থ্রুতে প্রসিড করুন। যদি মামলা হয় তাহলে আমি খবরটা ছেপে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। আর নইলে খুনের যথেষ্ট এভিডেনস চাই। এলাহাবাদের লোকাল কাগজে কি খবরটা বেরিয়েছিল?

না।

তবে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে কিছু জানাননি?

জানিয়েছি, কিন্তু তারা কোনও গা করছে না।

কেন?

তারা এটাকে খুন বলে মনে করছে না যে। তারা লাশ চায়।

লাশ! কেন, লাশ পাওয়া যায়নি?

না। কী করে যাবে? টুপুকে যে একটা পাহাড়ি নদীতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কোথায়?

টুপুর মা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেন, কোথায় তা আমি ঠিক জানি না।

তাহলে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? সাক্ষী আছে?

ন্ ন্ নাঃ।

তবে কী করে জানলেন?

ওরা কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে যায় আরও অনেক জায়গায়। সবশেষে ঘটনাটা ঘটে মাইথনে।

মাইথনে?

খুব নির্জন জায়গা। ওরা ফরেস্ট বাংলোতে থাকত।

কারা? টুপু আর কে?

ওঃ, সে ঠিক জানি না।

না জানলে কী করে হবে? টুপু কার সঙ্গে গিয়েছিল তা আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত।

কী করে নেব? আমি অনাথা বিধবা। টুপুর তো বাবা নেই, ভাইবোন নেই। টুপু একটিমাত্র। তবে আমাদের টাকা আছে। অনেক টাকা। খবরটা ছাপানোর জন্য যদি টাকা খরচ করতে হয় তো আমি পিছুপা হব না। বুঝলেন? টুপুই যখন নেই তখন এত টাকা আমার কোন কাজে লাগবে? আমি আপনাকে খবরটা ছাপানোর জন্য হাজার টাকা দিতে পারি। রাজি?

না।— ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, টাকা থাকলে আপনি বরং তা সৎ কাজেই ব্যয় করুন, খবরটা ছাপা গেলে আমি এমনিতেই ছাপতাম।

কিছুতেই ছাপা যাবে না?

ধৃতি হঠাৎ প্রশ্ন করে, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

টুপুর মা খানিক নিস্তব্ধ থেকে বললেন, কেন বলুন তো?

এলাহাবাদ থেকে কি?

আবার খানিক চুপচাপ থাকার পর টুপুর মা বলেন, না।

তবে কি কলকাতা থেকে?

হ্যাঁ। আমি কাল কলকাতায় এসেছি।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনার চিঠিটাও কিন্তু কলকাতা থেকে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও চিঠিতে ডেটলাইন ছিল এলাহাবাদের।

টুপুর মা লজ্জার স্বরে বলেন, সে একটা কাণ্ড। আমার একজন চেনা লোককে চিঠিটা ডাকে দিতে দিই। সে সেইদিনই কলকাতা যাচ্ছিল। তাই একেবারে কলকাতায় গিয়ে ডাকে দিয়েছে। কিছু মনে করেছিলেন বোধহয়!

না, মনে কী করব? এরকম হতেই পারে।

আপনি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন?

বিব্রত ধৃতি বলে, না না।

আমি কলকাতায় এসেছিলাম টুপুর ব্যাপারেই। টুপু কলকাতায় কোথায় ছিল তা আমি জানি না।

কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

টুপু কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল?

কেন, বলিনি আপনাকে সে কথা?

না।

টুপুর মা একটু হেসে বললেন, ওমা! আমারই ভুল তবে। যা হোক, আজকাল আমার মেমরিটা একদম গেছে। হ্যাঁ, টুপু তো পালিয়েই এসেছিল। টুপু যত সুন্দরী ছিল ততটা শান্ত বা বাধ্য ছিল না। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ।

ও। তা পালাল কেন?

আমি যা বারণ করতাম তাই করব এই ছিল স্বভাব টুপুর। ও খানিকটা ছেলের মতো মানুষ হয়েছিল তো। সাইকেল, সাঁতার, গাড়ি চালানো, বন্দুক ছোঁড়া সব জানত।

খুব চৌখস মেয়ে তো!

খুব। একস্ট্রা-অর্ডিনারি যাকে বলা যায়।

পালাল কেন তা তো বললেন না।

টুপুর যে বিয়ের ঠিক হয়েছিল!

টুপু বিয়েতে রাজি ছিল না বুঝি?

না। ও বলত আর একটু বয়স হলে সে মাদার টেরেসার আশ্রমে বা সৎসঙ্গ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবে। সারা জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে।

কেন?

ও পুরুষদের পছন্দ করত না। না, কথাটা ভুল বলা হল। আসলে ও কখনও তেমন পুরুষ দেখেনি যাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করা যায়। সব পুরুষমানুষকেই ও খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। বলত, এদের কাউকে বিয়ে করা যায় না।

কিন্তু পালানোর ব্যাপারটা তো বললেন না?

বলছি। আমরা ওর বিয়ে ঠিক করি একজন ব্রিলিয়ান্ট অ্যামেরিকা ফেরত মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দারুণ ছেলে। টুপুর আপত্তি আমরা শুনিনি।

কেন?

শুনিনি তার কারণ চট করে এরকম ভাল পাত্র কি পাওয়া যায়, বলুন? যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব, দেদার টাকা রোজগার করে, হাই পোজিশনে চাকরি করছে।

তারপর?

আশীর্বাদের আগের দিন টুপু একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গেল। কাউকে, এমনকী আমাকে পর্যন্ত জানিয়ে যায়নি।

সঙ্গে কেউ যায়নি?

কী করে বলব?

কলকাতায় গিয়েছিল কী করে জানলেন?

সেখান থেকে আর একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখে, আমি খুব ফুর্তিতে আছি। এবার বেড়াতে যাব দার্জিলিং, নেতারহাট, মাইথন, আরও কয়েকটা জায়গার নাম লেখে। সব মনে নেই।

কিন্তু মারা যাওয়ার ব্যাপারটা?

ওঃ হ্যাঁ। মাইথন থেকে ওর শেষ চিঠি। তাতে ও খুব মন খারাপের কথা লিখেছিল। জানিয়েছিল যে কে বা কারা ওর পিছু নিয়েছে। তারা ওর ভাল করতে চায় না, ক্ষতি করতে চায়।

তারপর?

তারপর আর কোনও খবর নেই। তবে আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখি যে টুপু উঁচু থেকে জলের

মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আপনি কখনও মাইথনে গেছেন?

গেছি।

আমি যাইনি। জায়গাটা কেমন?

সুন্দর।

সেখানে পাহাড় আছে?

আছে। তবে ছোট পাহাড়।

টুপুও তাই লিখেছিল। সেখানে কী একটা বিখ্যাত মন্দির আছে না?

আছে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির।

সেখানে সেই মন্দিরে ঢোকবার গলিতে নাকি কারা টুপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শাসিয়েছিল যে মেরে ফেলবে।

কিন্তু কেন?

সে তো জানি না। টুপুর মতো মেয়ের কি শত্রু থাকতে পারে? তবু ছিল, জানেন। আর টুপু যে খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের ছিল।

বুঝলাম। কিন্তু টুপুর সঙ্গে কেউ ছিল না?

হয়তো ছিল। তাদের কথা টুপু লিখত না।

কলকাতায় আপনাদের আত্মীয়স্বজন নেই?

আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে। তবে আমার দিককার কোনও আত্মীয় এদিকে থাকে না। আমার বাপের বাড়ি গোরক্ষপুরে, তিন পুরুষের বাস।

টুপু কি তার বাপের বাড়িতে উঠেছিল?

টুপুর মা হেসে বললেন, টুপুর বাপের বাড়ি বলতে অবশ্য এলাহাবাদের বাড়িই বোঝায়। তবে এখানে আমার স্বামীর খুড়তুতো ভাই-টাই আছেন। বাড়ির একটা অংশ অবশ্য আমাদের। সে অংশ তালা দেওয়া থাকে, আমরা কলকাতায় এলে সেখানেই উঠি। কিন্তু টুপু এ বাড়িতে আসেনি।

ধৃতি এতক্ষণ পরে টের পেল যে, সে খামোখা এত কথা বলছে বা শুনছে। শুনে তার কোনও লাভ নেই। টুপুর ব্যাপারে তার করারও কিছু নেই।

ধৃতি বলল, সবই বুঝলাম। কিন্তু সিমপ্যাথি জানানো ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন?

শুনুন। দয়া করে আপনার বাসার ঠিকানাটা দেবেন?

কেন?

বিরক্ত হবেন না। ঠিকানাটা থাকলে আমি যদি দরকারে পড়ি তাহলে কন্ট্যাক্ট করতে পারব। আমি কলকাতার কিছুই চিনি না। আমার দেওররাও খুব সিমপ্যাথেটিক নয়। আমি আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য পেলে খুব উপকৃত হব। অবশ্য যদি কখনও দরকার হয়। নইলে এমনিতে বিরক্ত করব না।

একটু দ্বিধা করেও ধৃতি ঠিকানা বলল।

আপনার বাসায় ফোন নেই?

না।

আচ্ছা, ছাড়ছি।

ভদ্রমহিলা ফোন রাখলেন। ধৃতি হাঁফ ছাড়ল।

৫

পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে দামি ডিনার খেল ধৃতি। মাঝে মাঝে খায়। বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। যতদিন এরকম একা আছে ততদিন আমিরি করে নিতে পারবে।

বিয়ে ধৃতি করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের কথা ভাবতে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু ভয় পায়। সে একটু প্রাচীনপন্থী। আজকালকার মেয়েদের হাব-ভাব আর চলাফেরা দেখে তার ভয় লাগে। এরা তো ঠিক বউ হতে পারবে না। বড়জোর কম্প্যানিয়ন হতে পারে, আর বেড-ফ্রেন্ড।

ট্যাক্সি ছেড়ে ধৃতি ফ্ল্যাটে উঠে এল। দরজা ভাল করে বন্ধ করল। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে টেবিলের সামনে বসে সিগারেট ধরাল। এখন রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকবে। কয়েকটা থ্রিলার কেনা আছে। পড়বে। তার আগে একটু কিছু লিখবে। এই একা নিশুত রাতে জেগে থাকা তার বড় প্রিয়। এইটুকু একেবারে তার নিজস্ব সময়।

শৌখিন রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে চিঠির বাক্সটা দেখে আসেনি।

আবার উঠে নীচে এল ধৃতি। চিঠি পেতে সে ভীষণ ভালবাসে। রোজ চিঠি এলে কত ভাল হয়।

চিঠি ছিল। দুটো। দুটোই খাম। একটার ওপর দিদির হাতের লেখা ঠিকানা। বোধহয় দীর্ঘকাল পর মনে পড়েছে ভাইকে। আর একটা খামে কোনও ডাকটিকিট নেই, হাতের লেখা অচেনা।

নিজের ঘরে এসে ধৃতি দিদির চিঠিটা প্রথমে খুলল। ভাইয়ের জন্য দিদি একটি পাত্রী দেখেছে। চিঠির সঙ্গে পাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ফোটোও আছে। দেখল ধৃতি। মন্দ নয়। তবে একটু আপস্টার্ট চেহারা। দিল্লিতে বি এ পড়ে। বাবা সরকারি অফিসার।

ধৃতি অন্য চিঠিটা খুলল। সাদা কাগজে লেখা— একা বাসায় ভূতের ভয় পাচ্ছেন না তো। ভূত না হলেও পেতনিরা কিন্তু আছে। সাবধান। আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে গেছি। যা অন্যমনস্ক আপনি, হয়তো লক্ষই করেননি। ফ্রিজে একটা চমৎকার খাবার রেখে যাচ্ছি। খাবেন। মেয়েরা কিন্তু খারাপ হয় না, পুরুষগুলোই খারাপ। চিঠিটা লেটারবক্সে রেখে যাচ্ছি যাতে চট করে নজরে পড়ে।— পরমা। পুঃ পরশু হয়তো আবার আসব। দুপুরে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

ধৃতি উঠে গিয়ে ডাইনিং হলে ফ্রিজ খুলল।

কথা ছিল এ ক'দিন ফ্রিজ বন্ধ থাকবে। ছিলও তাই। পরমা আজ চালিয়ে রেখে গেছে। একটা কাচের বাটিতে ক্ষীরের মতো কী একটা জিনিস। ঠান্ডা বস্তুটা মুখে ঠেকিয়ে ধৃতি দেখে পায়েস। তাতে কমলালেবুর গন্ধ। কাল খাবে।

ফ্রিজ বন্ধ করে ধৃতি হলঘর যখন পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ খেয়াল হল বাইরের দরজাটি কি সে বন্ধ করেছে? এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ঘোরাতেই বেকুব হয়ে বুঝল, সত্যিই বন্ধ ছিল না দরজাটা।

সকালে উঠে ধৃতি টের পায় সারা রাত ঘুমের মধ্যে সে কেবলই টুপুর কথা ভেবেছে। খুবই আশ্চর্য কথা।

টুপুর কথা সে ভাববে কেন? টুপু কে! টুপুকে সে তো চোখেও দেখেনি। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। নিজের কোনও দুর্বলতা বা মানসিক শ্লথভার ধরা পড়লে ধৃতি খুশি হয় না।

টুপু বা টুপুর মা'র সমস্যা নিয়ে তার ভাববার কিছু নেই। ঘটনাটার মধ্যে হয়তো কিছু রহস্য আছে। তা থাক। সে রহস্য না জানলেও তার চলবে। টুপুর মা কি পাগল? হলেই বা তার তাতে কী?

টুপু কি বেঁচে আছে? টুপু কি সত্যিই বেঁচে নেই? এসব জানবার বা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। ধৃতি স্বপ্ন-দেখা মানুষ নয়, কল্পনার ঘোড়া ছাড়তেও সে পটু নয় তেমন।

তবু কাল সারা রাত, ঘুমের মধ্যে সে কেন টুপুর কথা ভেবেছে?

দাঁত মেজে ধৃতি নিজেই চা তৈরি করে খেল। পত্রিকাটা বারান্দা থেকে এনে খুলে বসল। খবর কিছুই নেই। তবু যথাসম্ভব সে যখন খবরগুলো পড়ে দেখছে তখনও টের পেল বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে তার নানা চিন্তা-ভাবনা ঢুকে যাচ্ছে।

এবং ফের টুপুর কথাই ভাবছে সে। জ্বালাতন।

পত্রিকা ফেলে রেখে সিগারেট ধরিয়ে নিজের এই অদ্ভুত মানসিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করতে থাকে ধৃতি। কিন্তু বিশ্লেষণ করে কিছুই পায় না। টুপুর সঙ্গে তার সম্পর্ক মাত্র একটি ফোটোর ভিতর দিয়ে। সে ফোটোটাও খুব নির্দোষ নয়। আর টুপুর মা টেলিফোনে এবং চিঠিতে টুপুর সম্বন্ধে যা লিখেছে সেইটুকু মাত্র তার জানা। অবশ্য এগুলো যোগ-বিয়োগ করে নিয়ে একটা রক্তমাংসের মেয়েকে কল্পনা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু ততদূর কল্পনাপ্রবণ তো ধৃতি এতকাল ছিল না!

অন্যমনস্কতার মধ্যে সে কখন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে, ফ্রিজ থেকে পরমার রেখে যাওয়া পায়েস বের করে খেয়েছে, আবার চা করেছে। ফের সিগারেটও ধরিয়েছে।

বিকেলের শিফটে ডিউটি। সারাটা দিনের অবকাশ পড়ে আছে। কাজ নেই বলে ধৃতি বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসল। চমৎকার বারান্দাটা। নীচে রাস্তা। সারাদিন বসে বসে লোক চলাচল দেখা যায়।

দেখছিল ধৃতি। কিন্তু আবার দেখছিলও না। তার কেবলই মনে হয়, টুপুর মা যা বলছে তার সবটা সত্যি নয়। টুপু যে মারা গেছেই তার কোনও প্রমাণ নেই। সেটা হয়তো কল্পনা বা গুজব। টুপু বেঁচে আছে ঠিকই। একটা কথা কাল টুপুর মাকে জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে, টুপুর ফোটোতে তার পাশে কে ছিল, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

ধৃতির অবকাশ যে অখণ্ড তা নয়। সেই ফিচারটা সে এখনও লিখে উঠতে পারেনি। প্রায় দু' সপ্তাহ আগে অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর তাকে ডেকে পণপ্রথা নিয়ে আর একটা ফিচার লিখতে বলেছেন। দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া ছিল। বিভিন্ন বাড়ির গিন্নি, কলেজ-ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী, সমাজের নানা স্তরের মানুষজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। সে কাজ পড়ে আছে ধৃতির। এক অবান্তর চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতদিন তেমন প্রকট ছিল না, কিন্তু কাল বহুক্ষণ টুপুর মা-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকেই তার মাথাটা অশরীরী বা নিরুদ্দেশ টুপুর হেপাজতে চলে গেছে।

আজ সময় আছে। ধৃতি টুপুর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সাজপোশাক করে বেরিয়ে পড়ল।

প্রফেসরদের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে পুলক নিমীলিত চোখে আধশোয়া হয়ে চুরুট টানছে, এমন দৃশ্যই দেখবে বলে আশা করেছিল ধৃতি। হুবহু মিলে গেল। প্রফেসরদের চাকরিটা আলসেমিতে ভরা। সপ্তাহে তিন-চারদিন ক্লাস থাকে, বছরে লম্বা লম্বা গোটা দুই-তিন ছুটি, আলসে না হয়ে উপায় কী? এই পুলক যে একসময়ে ফুটবলের ভাল লেফট আউট ছিল তা আজকের মোটাসোটা চেহারাটা দেখে মালুম হয় না। মুখে সর্বদা স্নিগ্ধ হাসি, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত চাউনি, হাঁটাচলায় আয়েসি মন্থরতা।

ধৃতিকে দেখে সোজা হওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, আরে! আজই কি তোমার আসবার কথা ছিল নাকি? স্টুডেন্টরা তো বোধহয় কাঁ একটা সেমিনারে গেল!

ধৃতি একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, আজই আসবার কথা ছিল না ঠিকই। তবে এসে যখন গেছি তখন দু'-চারজনকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। ইন্টারভিউটা আজ না নিলেই নয়!

দেখছি, তুমি বোসো।— বলে পুলক দু' মনি শরীর টেনে তুলল। রমেশ নামক কোনও বেয়ারাকে ডাকতে ডাকতে করিডোরে বেরিয়ে গেল।

পুলকদের কমপারেটিভ লিটারেচারে ছাত্র নগণ্য, ছাত্রীই বেশি। এসব ছাত্রীরাও আবার অধিকাংশই বড়লোকের মেয়ে। পণপ্রথাকে এরা কোন দৃষ্টিতে দেখে তা ধৃতির অজানা নয়। চোখা

চালাক আলট্রা স্মার্ট এসব মেয়েদের পেট থেকে কথা বের করাও মুশকিল। কিছুতেই সহজ সরলভাবে অকপট সত্যকে স্বীকার করবে না। ধৃতি তাই মনে মনে তৈরি হচ্ছিল।

মিনিট কুড়ি-পাঁচশের চেষ্টায় পুলক একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে জনা ছয়েক মেয়ে ও একটি ছেলেকে জুটিয়ে দিল। ছটির মধ্যে চারটি মেয়েই দারুণ সুন্দরী। বাকি দু'জনের একজন একটু বয়স্কা এবং বিবাহিতা, অন্যটি সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কালো আভরণহীন রূপটানহীন চেহারাটায় এক ধরনের ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

ধৃতি আজকাল মেয়েদের লজ্জা পায় না, আগে পেত। সুন্দরীদের ছেড়ে সে কালো মেয়েটিকেই প্রথম প্রশ্ন করে, আপনার বিয়েতে যদি পাত্রপক্ষ পণ চান তাহলে আপনার রিঅ্যাকশন কী হবে?

আমি কালো বলে বলছেন?

তা নয়, বরং আপনাকেই সবার আগে নজরে পড়ল বলে।

মেয়েটি কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে বলে, প্রথমত আমার বিয়ে নেগোশিয়েট করে হবে না, আমি নিজেই আমার মেট বেছে নেব, পণের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নটাকে অত পারসোনেলি নেবেন না। আমি পণপ্রথা সম্পর্কে আপনার মত জানতে চাইছি।

ছেলেরা পণ চাইলে মেয়েদেরও কিছু কন্ডিশন থাকবে।

কী রকম কন্ডিশন?

বাবা-মা'র সঙ্গে থাকা চলবে না, সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, ঘরের কাজে হেলপ করতে হবে, উইক এন্ডে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, রান্না এবং ঘরের সব কাজের জন্য লোক রাখতে হবে, স্বামীর পুরো রোজগারের ওপর স্ত্রীর কন্ট্রোল থাকবে...এরকম অনেক কিছু।

সুন্দরীদের মধ্যে একজন ভারী সুরেলা গলায় বলে ওঠে, অলকা আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে।

ধৃতি লিখতে লিখতে মুখ তুলে হেসে বলে, তাহলে আপনিই বলুন।

আমি! ওঃ, পণপ্রথা শুনলে এমন হাসি পায় না!— বলে মেয়েটি বাস্তবিকই হাতে মুখ ঢেকে হেসে ওঠে। সঙ্গে অন্যরাও।

ধৃতি একটু অপেক্ষা করে। হাসি থামলে মৃদু স্বরে বলে, ব্যাপারটা অবশ্য হাসির নয়।

মেয়েটি একটু গলা তুলে বলে, সিস্টেমটা ভীষণ প্রিমিটিভ।

আধুনিক সমাজেও বিস্তর প্রিমিটিভনেস রয়ে গেছে যে।

তা জানি। সেই জন্যই তো হাসি পায়।

এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে আপনি কী করতে চান?

কেউ পণ-টন চাইলে আমি তাকে বলব, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে।

বিবাহিতা মহিলাটি উসখুস করছিলেন। এবার বললেন, না না, শুনুন। আমি বিবাহিতা এবং একটি মেয়ের মা। আমি জানি সিস্টেমটা প্রিমিটিভ এবং হাস্যকর। তবু বলি, এই ইভিলটাকে ওভাবে ট্যাকল করা যাবে না। আমার মেয়েটার কথাই ধরুন। ভীষণ সিরিয়াস টাইপের, খুব একটা স্মার্টও নয়। নিজের বর নিজে জোগাড় করতে পারবে না। এখন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যদি আমি একটা ভাল পাত্র পাই এবং সেক্ষেত্রে যদি কিছু পণের দাবি থাকেও তবে সেটা অন্যায় জেনেই মেয়ের স্বার্থে হয়তো আমি মেনে নেব।

সুন্দরী মেয়েটা বলল, তুমি শুধু নিজের মেয়ের কথা ভাবছ নীতাদি।

মেয়ের মা হ' আগে, তুইও বুঝবি।

ধৃতি প্রসঙ্গ পালটে আর একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে, পণপ্রথা ভীষণ খারাপ তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা টিফলিশ প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা আপনাকে করব?

খুব শক্ত প্রশ্ন নয় তো?

পুলক পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরবে চুরুট টেনে যাচ্ছিল। এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে

বলল, তুমি একটি আস্ত বিচ্ছু ইন্দ্রাণী। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি তোমার চেয়েও বিচ্ছু। ওয়াচ ইয়োর স্টেপ।

ইন্দ্রাণী উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলে, কংগ্র্যাটস মিস্টার বিচ্ছু। বলুন প্রশ্নটা কী।

ধৃতি খুব অকপটে মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল। এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেনি। লক্ষ করে এখন হাঁ হওয়ার জোগাড়। ছবির টুপুর সঙ্গে আশ্চর্য মিল। কিন্তু গল্পে যা ঘটে, জীবনে তা ঘটে খুবই কদাচিৎ। এ মেয়েটির আসল টুপু হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, ধৃতি তাও জানে। সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা লক্ষ করেছি পাত্রপক্ষ আজকাল যতটা দাবিদাওয়া করে তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি থাকে স্বয়ং পাত্রীর।

তাই নাকি?

মেয়েরা আজকাল বাবা-মায়ের কাছ থেকে নানা কৌশলে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। পণপ্রথার চেয়ে সেটা কি ভাল?

ইন্দ্রাণীর মুখ হঠাৎ ভীষণরকম গম্ভীর ও রক্তাভ হয়ে উঠল। মাথায় একটা ঝাপটা খেলিয়ে বলল, কে বলেছে ওকথা? মোটেই মেয়েরা বাপের কাছ থেকে আদায় করে না। মিথ্যে কথা।

ধৃতি নরম গলায় বলে, রাগ করবেন না। এগুলো সবই জরুরি প্রশ্ন, আপনাকে অপ্রতিভ করার জন্য প্রশ্নটা করিনি।

বিবাহিতা মহিলাটি আগাগোড়া উসখুস করছিলেন, এখন হঠাৎ বলে উঠলেন, ইন্দ্রাণী যাই বলুক আমি জানি কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েরা আজকাল বড্ড ওরকম হয়েছে।

এককথায় ইন্দ্রাণী চটল। বলল, মোটেই না নীতাদি। তোমার এক্সপেরিয়েন্স অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা এই জেনারেশনের মেয়েরা মোটেই ওরকম নই। বরং আমরা মেয়েরা যতটা মা-বাবার দুঃখ বুঝি ততটা এ যুগের ছেলেরা বোঝে না।

নীতা বললেন, সেকথাও অস্বীকার করছি না।

তাহলে? আজকালকার ছেলেরা তো বিয়ে করেই বাবা-মাকে আলাদা করে দেয়। দেয় না বলো?

নীতা হেসে বললেন, সে তো ঠিকই, কিন্তু এ যুগের ছেলেরা বিয়ে করে কাকে সেটা আগে বল, তোর মতো একালের মেয়েদেরই তো।

তা তো করেই।

সেই মেয়েরাই তো বউ হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দেয়।

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলে, ওটা একপেশে কথা হল। সবসময়ে বউরাই পরামর্শ দেয় না, ছেলেরা নিজেরাই ডিসিশন নেয়। তোমার ডিফেক্ট কী জানো? ওভার সিমপ্লিফিকেশন।

ধৃতি বিপদে পড়ে চুপ করে ছিল। এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। পণপ্রথা নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ইন্দ্রাণী তার উজ্জ্বল ও সুন্দর মুখখানা হঠাৎ ধৃতির দিকে ফিরিয়ে ঝাঝালো গলায় বলল, এবার বলুন তো রিপোর্টারমশাই, নিজের বিয়ের সময় আপনি কী করবেন?

আমি!— ধৃতি একটু অবাক হল। তারপর এক গাল হেসে বলল, আমার বিয়ে তো কবে হয়ে গেছে। আমি ইনসিডেন্টালি তিন ছেলেমেয়ের বাপ।

ইন্দ্রাণীর চোখে আচমকাই একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কিন্তু টক করে মাথাটা নুইয়ে নিল সে। তারপর ফের নিপাট ভালমানুষের মতো মুখটা তুলে বলল, আপনি পণ নেননি?

ধৃতি খুব লাজুকভাবে চোখ নামিয়ে বলল, সামান্য চাকরি, তাই পণও সামান্যই নিয়েছিলাম হাজার পাঁচেক।

এই স্বীকারোক্তিতে সকলে একটু চুপ মেরে গেল। কিন্তু একটা নিঃশব্দ ছিছিক্কার স্পষ্ট টের পাচ্ছিল ধৃতি।

হঠাৎ পুলক হেসে ওঠায় অ্যাটমসফিয়ারটা মার খেয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বলল, ইয়ারকি মারছেন, না?

কেন?

আপনি মোটেই বিয়ে করেননি।

আমার বিয়েটা ফ্যাক্টর নয়। আপনি এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।

ইন্দ্রাণী বলল. জবাব দিইনি কে বলল? আমরা মোটেই ওরকম নই।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল ধৃতি কিন্তু তেমন কোনও লাভ হল না। বারবার তর্ক লেগে যেতে লাগল। শেষে ঝগড়ার উপক্রম।

অবশেষে ইন্টারভিউ শেষ করে ধৃতি উঠে পড়ল। যেটুকু জানা গেছে তাই যথেষ্ট।

পুলক নিয়ে গিয়ে কফি খাওয়াল। নিজে থেকে যেচে বলল, ইন্দ্রাণী মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগল?

খারাপ কী?

শি ইজ ইন্টারেস্টিং। পরে ওর কথা তোমাকে বলব। শি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং।

ধৃতি ফিরে এল বাসায়।

৬

টুপুর খোঁজ যদি ধৃতিকে করতেই হয় তবে তার কিছু সহায়-সম্বল দরকার। তামাম কলকাতা, মাইথন, এলাহাবাদ বা ভারতবর্ষের সমগ্র জনবসতির মধ্যে কোথায় টুপু লুকিয়ে আছে তা একা খুঁজে দেখা ধৃতির পক্ষে অসম্ভব। টুপু মরে গেছে কি না তাও বোধহয় সঠিক জানা যাবে না। মাইথনের পুলিশের কাছে কোনও রেকর্ড না থাকারই সম্ভাবনা।

এক দুপুরে ধৃতি টুপু সংক্রান্ত চিঠি ও ফোটো বের করে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বসল। টেলিফোনে টুপুর মা'র সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে লিখল ডায়েরিতে। জয়ন্ত সেন আর কালীবাবুর সঙ্গে যা সব কথাবার্তা হয়েছে তাও বাদ দিল না। পুরো একখানা কেস হিস্ট্রি তৈরি করছিল সে। মাঝপথে কলিংবেল বাজল এবং রসভঙ্গ করে উদয় হলেন পরমা। সঙ্গে বাচ্চা ঝি।

ইস্! কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কানটাও গেছে দেখছি।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, কতক্ষণ জ্বালাবে বলো তো! ঘরের কাজ কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে কেটে পড়ো। আমার জরুরি লেখা আছে।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে চোখ গোল করে বলে, বলি এ ফ্ল্যাটটা আমার না আর কারও? আমারই ফ্ল্যাট থেকে আমাকেই কিনা সরে পড়তে বলা হচ্ছে! মগের রাজত্ব নাকি?

ফ্ল্যাট তোমার হতে পারে কিন্তু আমারও প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে।

ইঃ প্রাইভেসি! ব্যাচেলরদের আবার প্রাইভেসি কী? তারা হবে সরল, দরজা জানালা খোলা ঘরের মতো, আকাশের মতো, শিশুর মতো।

থাক থাক। তুমি যে কবিতা লিখতে তা জানি।

খারাপও লিখতাম না। বিয়ে হয়েই সর্বনাশ হয়ে গেল। কবিতা উবে গেল, প্রেম উবে গেল।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও।

তার মানে?

কিছু বলিনি।

পরমা চোখ এড়িয়ে বলল, আমার অ্যাবসেনসে ঘরে কাউকে ঢোকাননি তো! ছেলেরা চরিত্রহীন হয়!

বলতে বলতে পরমা ধৃতিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘরের পর্দা সরাল। পরমুহূর্তেই 'ওম্মা!' বলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ধৃতি বুঝল সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন টুপুর ফোটো লুকোনোর চেষ্টা বৃথা। তাই সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর ও ভ্রূকুটিকুটিল করে নিজের ঘরে এল।

পরমা খাটের ওপর সাজানো কাগজপত্র আর ফোটো আঠামাখানো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শ্বাস ফেলে বলল, চরিত্রহীন! আগাপাশতলা চরিত্রহীন!

কে?

পরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, প্রায় আমার মতোই সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন, আর সে খবরটা একবার জানাননি পর্যন্ত!

তোমার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

ইস্। আসুক না একবার কাছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। সাহস আছে?

আস্তে পরমা, কেউ শুনলে হাসবে।

কে আছে এখানে শুনি! আর হাসবারই বা কী আছে?

উদাস ভাবে ধৃতি বলে, পাখি-টাখিও তো আসে জানালায়, বাতাসও তো আসে, তারাই শুনে হাসবে।

চোখ পাকিয়ে পরমা বলে, হাসবে কেন?

তোমার চ্যালেঞ্জ-এর কথা শুনে। মেয়েটা কে জানো?

কে? সেটাই তো জানতে চাইছি।

মিস ক্যালকাটা ছিল, এখন মিস ইন্ডিয়া। হয়তো মিস ইউনিভার্স হয়ে যাবে।

ইল্লি। অত সোজা নয়। এবারের মিস ক্যালকাটা রুমা চ্যাটার্জি আমার বান্ধবীর বোন।

তুমি একজন সাংবাদিককে সংবাদ দিচ্ছ?

পরমা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা হার মানলাম। রুমা গতবার হয়েছিল।

এ এবার হয়েছে।

সত্যি?

সত্যি।

নাম কী?

টুপু।

যাঃ, টুপু একটা নাম নাকি? ডাকনাম হতে পারে। পোশাকি নাম কী?

তোমার বয়স কত হল পরমা?

আহা, বয়সের কথা ওঠে কীসে?

ওঠে হে ওঠে, ইউ আর নট কিপিং উইথ দা টাইম। তোমার আমলে পোশাকি নাম আর ডাকনাম আলাদা ছিল। আজকাল ও সিস্টেম নেই। এখন ছেলেমেয়েদের একটাই নাম থাকে। পল্টু, ঝন্টু, পুসি, টুপু, রুণু, নিনা...

থাক থাক, নামের লিস্টি শুনতে চাই না। মেয়েটার সঙ্গে আপনার রিলেশন কী?

পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীর সঙ্গে আমার একটা রিলেশন। দাতা এবং গ্রহীতার।

তার মানে?

অর্থাৎ তারা সৌন্দর্য বিতরণ করে এবং আমি তা আকণ্ঠ পান করি।

আর কিছু না?

ধৃতি মাথা নেড়ে করুণ মুখ করে বলে, তোমার চেহারাখানা একেবারে ফেলনা নয় বটে, কেউ কেউ সুন্দরী বলে তোমাকে ভুলও করে মানছি, কিন্তু আজ অবধি বোধহয় ভুল করেও তোমাকে কেউ বুদ্ধিমতী বলেনি!

পরমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এ মা, কী সব অপমান করছে রে মুখের ওপর!

ভাই বন্ধুপত্নী, দুঃখ কোরো না, সুন্দরীদের বুদ্ধিমতী না হলেও চলে। কিন্তু এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, একজন যৎসামান্য বেতনের সাব-এডিটরের সঙ্গে মিস ক্যালকাটার দেবী ও ভক্ত ছাড়া আর কোনও রিলেশন হতে পারে না!

খুব পারে। নইলে ফোটোটা আপনার কাছে এল কী করে?

সে অনেক কথা। আগে তোমার ওই বাহনটিকে এক কাপ জমাটি কফি বানাতে বলো।

বলছি। আগে একটু শুনি।

আগে নয়, পরে। যাও।

উঃ!— বলে পরমা গেল।

পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বলল, কফি আসছে, বলুন।

মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগছে?

মন্দ কী?

না না, ওরকম ভাসা-ভাসা করে নয়। বেশ ফিল করে বলো। ছবিটার দিকে তাকাও, অনুভব করো, তারপর বলো।

নাকটা কি একটু চাপা?

তাই মনে হচ্ছে?

ফোটোতে বোঝা যায় না অবশ্য। ঠোঁটদুটো কিন্তু বাপু, বেশ পুরু।

আগে কহো আর।

আর মোটামুটি চলে।

হেসে ফেলে বলে, বাস্তবিক মেয়েরা পারেও।

তার মানে?

এত সুন্দর একটা মেয়ের এতগুলো খুঁত বের করতে কোনও পুরুষ পারত না।

পরমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ইঃ পুরুষ! পুরুষদের আবার চোখ আছে নাকি? মেয়ে দেখলেই হ্যাংলার মতো হামলে পড়ে।

সব পুরুষই হ্যাংলা নয় হে বন্ধুপত্নী। এত পুরুষের মাথা খেয়েছ তবু পুরুষদের এখনও ঠিকমতো চেনোনি।

চেনার দরকার নেই। এবার বলুন তো ফোটোটা সত্যিই কার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, আগে আমার কথা একটু-আধটু বিশ্বাস করতে, আজকাল বিশ্বাস করাটা একদম ছেড়ে দিয়েছ।

আপনাকে বিশ্বাস! ও বাবা, তার চেয়ে কেউটে সাপ বেশি বিশ্বাসী। যা পাজি হয়েছেন আজকাল।

তা বলে সাপখোপের সঙ্গে তুলনা দেবে?

দেবই তো। সব সময় আমাকে টিজ করেন কেন?

মুখ দেখে তো মনে হয় টিজিংটা তোমার কিছু খারাপ লাগে না।

লাগে না ঠিকই, তা বলে সবসময়ে নিশ্চয়ই পছন্দ করি না। যেমন এখন করছি না। একটা সিরিয়াস প্রশ্ন কেবলই ইয়ারকি মেরে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বলে পরমা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা কটাক্ষ করল।

ধৃতি নিজের বুকে দু'হাত চেপে ধরে বলল, মর গয়া। ওরকম করে কটাক্ষ কোরো না মাইরি। আমার এখনও বিয়ে হয়নি, মেয়েদের কটাক্ষ সামাল দেওয়ার মতো ইমিউনিটি নেই আমার।

খুব আছে। কটাক্ষ কিছু কম পড়ছে বলে মনে তো হয় না। আগে মেয়েদের ছবি ঘরে আসত না, আজকাল আসছে।

আরে ভাই, মেয়েটার ফোটো নয়। মিস ক্যালকাটা অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া। এর ওপর একটা ফিচার হচ্ছে আমাদের কাগজে। আমাকেই এর ইন্টারভিউ নিতে হবে। তাই...

পরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ যদি মিস ইন্ডিয়া হয়ে থাকে তবে তো খেঁদি-পেঁচিদের যুগ এল।

কফি এসে যেতে দু'জনেই একটু ক্ষান্ত দিল কিছুক্ষণ। কিন্তু পরমা চেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে খুব দুষ্টু চোখে লক্ষ করছিল ধৃতিকে। ধৃতি বলল, তুমি কফি খেলে না?

আমি তো আপনার আর আপনার বন্ধুর মতো নেশাখোর নই।

উদাস ধৃতি বলল, খেলে পারতে। কফিতে বুদ্ধি খোলে। বিরহের জ্বালাও কমে যায়।

আপনার মাথা। যাই বাবা, ঘরদোর সেরে আবার ফিরে যেতে হবে।

পরমা উঠল এবং দরজার কাছ বরাবর গিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, আচ্ছা, একটা কথা বলব?

বলে ফেলো।

এই যে আমার স্বামী দিল্লি গেছে বলে আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে, এটার কোনও অর্থ হয়?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

পরমা বেশ তেজের গলায় বলে, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। সব বুঝেও অমন না বোঝার ভান করেন কেন বলুন তো! আমি বলছি, রজত এখানে নেই বলে আমার এই ফ্ল্যাটে থাকা চলছে না কেন?

ধৃতি অকপট চোখে পরমার দিকে চেয়ে বোকা সেজে বলে, আমি আছি বলে।

আপনি থাকলেই বা কী? আমরা দু'জনেই থাকতে পারতাম। দিব্যি আড্ডা দিতাম, রান্না করতাম, বেড়াতাম।

ও বাবা, তুমি যে ভারী সাহসিনী হয়ে উঠেছ।

না না, ইয়ারকি নয়। আজকাল খুব নারীমুক্তি আন্দোলন-টন হচ্ছে শুনি, কিন্তু মেয়েদের এত শুচিবায়ু থাকলে সেটা হবে কী করে? পুরুষ মানেই ভক্ষক আর মেয়ে মানেই ভক্ষ্য বস্তু, এরকম ধারণাটা পালটানো যায় না?

ধৃতি পরমার সামনে এই বোধহয় প্রথম সত্যিকারের অস্বস্তি আর অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা খুব বেশি গভীর নয়। ভাববার দরকারও পড়েনি। কিন্তু পরমার প্রশ্নটি ভীষণ জরুরি বলেই তার মনে হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পণ লাগে, মেয়েরা একা সর্বত্র যেতে পারে না, মেয়েদের জীবনে অনেক বারণ।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পুরুষরা এখনও পুরোপুরি পশুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরমা। যেদিন পারবে সেদিন তোমরা অনেক বেশি ফ্রিডম পাবে।

পরমা মাথা নেড়ে বলল, পুরুষদের খামোখা পশু ভাবতে যাব কেন? বড়জোর তারা ডমিন্যান্ট, কিন্তু পশু নয়। আমার বাবা পুরুষ, আমার ভাই পুরুষ, আমার স্বামী পুরুষ। আমার পুরুষ ওয়েল উইশারেরও অভাব নেই। তাদের আমি পশুর দলে ভাবতে পারি না।

আলোচনাটা বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে পরমা।

পরমা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক পর্দা নিচু গলায় বলল, আমি সত্যিই বাপের বাড়িতে থাকতে ভালবাসি না। আপনার সঙ্গে আড্ডা মারাটাও আমার বেশ প্রিয়। কিন্তু তবু দেখুন,

আপনার মতো একজন নিরীহ পুরুষের সঙ্গ বর্জন করার জন্য আমাকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটা মেয়েদের পক্ষে অপমান নয়?

ধৃতি হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষেও। আমার ভয়ে যে তুমি পালিয়ে আছ এটা তো আমার পক্ষে সম্মানের নয়।

পরমা হঠাৎ ধৃতিকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল, আমি ভাবছি আজ আর বাপের বাড়ি যাব না। এখানেই থাকব। রাজি?

ধৃতি একটু হাসল। হাত দুটো উলটে দিয়ে বলল, আপকো মর্জি। আমি বারণ করার কে পরমা? এ তো তোমারই ফ্ল্যাট।

ওসব বলে দায়িত্ব এড়াবেন না। এটা কার ফ্ল্যাট সেটা এ প্রসঙ্গে বড় কথা নয়। আসল কথা হল আমি একজন যুবতী, আপনি একজন পুরুষ। আমরা এই ফ্ল্যাটে থাকলে আপনি কী মনে করবেন?

ধৃতি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, কিছু মনে করব না। কলকাতায় এরকম কতজনকে থাকতে হচ্ছে। কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি অত ভাবছ কেন?

ভাবছি আপনার জন্যই। রজত দিল্লি যাওয়ার আগে এই ব্যবস্থাটা করে গেছে। বিলেতে আমেরিকায় ঘুরে এসেও কেন যে ওর শুচিবায়ু কাটেনি তা কে বলবে? অথচ এতে করে খামোখা আপনাকে অপমান করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অপমান আমারও।

ধৃতি স্মিতমুখে বলল, রজতটা একটু সেকেলে। কিন্তু আমার মনে হয় ও বিশেষ তলিয়ে ভাবেনি।

ভাবা উচিত ছিল।

সকলেরই কি অত ভাবাভাবি আসে?

আপনার বন্ধুর না এলেও আমার আসে। তাই ঠিক করেছি থাকব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, থেকে যাও তা হলে।

খুশি মনে মত দিলেন তো!

দিচ্ছি। শুধু একটু কম টিকটিক করবে।

আমি কি বেশি টিকটিক করি?

না, না, তা বলছি না, তোমার টিকটিক করাটাও শুনতে ভারী ভাল। তবে কিনা—

বুঝেছি।—বলে পরমা রাগ করে বা রাগের ভান করে চলে গেল।

ধৃতি তাকে বেশি ঘাঁটাল না, বরং পণপ্রথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে রাখতে লাগল। তার ভাগ্য ভাল যে, প্রথম শ্রেণির একটি দৈনিক পত্রিকায় সে চাকরি করে এবং সাব-এডিটর হয়েও স্বনামে নানারকম ফিচার লেখার সুযোগ পায়। প্রাপ্ত এইসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ওপরে ওঠার পথ খোলা। সে লেখে ভাল, নামও আছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার পাঠকদের স্মৃতি খুবই কম। বারবার নামটা তাদের চোখে না পড়লে তারা তাকে মনেও রাখবে না। তবে ধৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখে এবং মোটামুটি সত্য ও তথ্যের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করে।

পরমা রাত্তিরে চমৎকার ডিনার খাওয়াল। আলুর দম, ডাল, পাঁপড় ভাজা আর স্যালাড। টুকটাক কথা হল। তবে ধৃতি অন্যমনস্ক ছিল, পরমাও।

রাত্রিবেলা ধৃতি একটা বই নিয়ে কাত হল বিছানায়। রোজকার অভ্যাস, কিছু না পড়লে ঘুম আসতে চায় না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পড়তে পড়তেই শুনতে পেল, পরমা তার ঘরের দরজা সন্তর্পণে ভেজাল এবং আরও সন্তর্পণে ছিটকিনি দিল। একটু হাসল ধৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরমা জানতে পারলে কি দুঃখিত হবে যে ধৃতি কখনওই পরমার প্রতি কোনও দৈহিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করে না? পরমা খুব সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ধৃতি সবসময়ে সবরকম সুন্দরী মেয়ের দিকে

আকৃষ্ট হয় না। তার একটু বাছাবাছি আছে। অনেক সময় আবার কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে।

সকালে পুলিশ এল।

আতঙ্কিত পরমা দৌড়ে এসে ঢুকল ধৃতির ঘরে। বিস্ফারিত চোখ, চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায় কী করে এসেছেন বলুন তো! এত সকালে পুলিশ কেন?

ধৃতি খুব নিবিষ্টমনে খবরের কাগজ পড়ছিল। চোখ তুলে বলল, গত সাত দিনে মোটে তিনটে খুন আর চারটে ডাকাতি করাতে পেরেছি। এত কম অপরাধে তো পুলিশের টনক নড়ার কথা নয়। যাক গে, আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

বলে ধৃতি উঠল।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, সবসময়ে ইয়ার্কি একদিন আপনার বেরোবে।

হ্যাঁ, যেদিন পালে বাঘ পড়বে।

বলে ধৃতি একটু হাসল। পুলিশ কেন এসেছে তা ধৃতি জানে। প্রধানমন্ত্রীর চা-চক্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। অল্প সময়ে সঠিক ঠিকানায় আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য লালবাজারের পুলিশকে সেই ভার দেওয়া হয়।

ধৃতি পিয়োন বুক-এ সই করে আমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে ফেলে রাখল। একটু অবহেলার ভঙ্গি। একটা চেয়ার টেনে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আর একবার একটু গরম জল খাওয়াও পরমা। আগের বারেরটা জমেনি।

দিচ্ছি।—বলে পরমা কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ।

ধৃতি আড়চোখে লক্ষ করছিল পরমাকে। বলল, ওটা আসলে ওয়ারেন্ট।

পরমা উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলল, ইস্, কী লাকি আপনি! প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্ন! ভাবতেই পারছি না।

ধৃতি উদাস মুখে বলল, অত উচ্ছ্বাসের কিছু নেই। ভি আই পি-দের সঙ্গ খুব সুখপ্রদ নয়, অনেক বায়নাক্কা আছে।

পরমা বলল, তবু তো কাছ থেকে দেখতে পাবেন, কথাও বলবেন! আচ্ছা, আমি যদি সঙ্গে যাই?

কী পরিচয়ে যাবে?

পরমা চোখ পাকিয়ে বলে, পরিচয় আবার কী? এমনি যাব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঢুকতে দেবে কেন? বউ হলেও না হয় কথা ছিল।

পরমা মুখ টিপে হেসে বলল, যদি তাই সেজেই যাই?

তোমার খুব উন্নতি হয়েছে পরমা।

তার মানে?

তুমি আর আগের মতো সেকেলে নেই। বেশ আধুনিক হয়েছ। আমার বউ সেজে রাজভবনে অবধি যেতে চাইছ।

আহা, তাতে দোষ কী?

রজত শুনলে মূর্ছা যাবে।

পরমা মুখোমুখি বসে বলল, কোন ড্রেসটা পরে যাবেন?

ড্রেস? ও একটা পরলেই হল।

মাথা নেড়ে পরমা বলে, না, যা খুশি পরে গেলেই চলবে নাকি? চকোলেট রঙের সেই বুশ শার্ট আর সাদা প্যান্ট— বুঝলেন?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, ও বাবা, তুমি আমার পোশাকেরও খবর রাখো দেখছি।

রাখব না কেন? ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি, তাই খবর রাখতে হয়।

ধৃতি খুব হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলে বলল, আজ তুমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছ না যে, আমাকে কোন প্লেসটা দিলে ভাল হয়। একটু আগে আমার বউ সাজতে চাইছিলে, এখন আবার বলছ ছোট ভাই। এরপর কি ভাসুর না মামাশ্বশুর?

পরমা লজ্জা পেয়ে বলে, যা বলেছি মনে থাকে যেন। সাদা প্যান্ট আর চকোলেট বুশ শার্ট।

ঠিক আছে।

প্রাইম মিনিস্টারকে কী জিজ্ঞেস করবেন?

করব কিছু একটা।

এখনও ঠিক করেননি?

প্রশ্ন করার স্কোপ কতটা পাওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় উনি বলবেন, আমাদের শুনে যেতে হবে।

তবু কিছু প্রশ্ন ঠিক করে রাখা ভাল।

ধৃতি কফি খেয়ে চিন্তিতভাবে উঠে দাড়ি কামাল, স্নান করল, খেল। তারপর পরমার কথামতো পোশাক পরে বাইরের ঘরে এল। বলল, এই যে পরমা, দেখো।

পরমা খাচ্ছিল, মুখ তুলে দেখে বলল, বাঃ, এই তো স্মার্ট দেখাচ্ছে।

এমনিতে দেখায় না?

যা ক্যাবলা আপনি!

আমি ক্যাবলা?

তাছাড়া কী?—বলে পরমা হাসল। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল, আজ আর বাইরে খেয়ে আসবেন না। আমি রেঁধে রাখব।

রোজ খাওয়ালে যে রজতটা ফতুর হয়ে যাবে।

যতদিন ও না আসছে ততদিন ওর বরাদ্দ খাবারটাই আপনাকে খাওয়াচ্ছি।

ধৃতি হাসল। বলল, ভাগ্যিস রজতের আর সব শূন্যস্থানও আমাকে পূরণ করতে হচ্ছে না।

বলেই টুক করে বেরিয়ে দরজা টেনে দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সে।

৭

ধৃতি অফিসে এসেই শুনল, ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চা-চক্রের রিপোর্টিং তাকেই করতে হবে। সে নিজেও যে আমন্ত্রিত এ কথাটা জেনে চিফ সাব এডিটর বঙ্কুবাবু বিশেষ খুশি হলেন না। বললেন, সবই কপাল রে ভাই। আমি পঁচিশ বছর এ চেয়ারে পশ্চাদ্দেশ ঘষে যাচ্ছি, কিছুই হয়নি।

ধৃতি জবাব দিল না। মনে মনে একটু দুঃখ রইল, কপাল যে তার ভাল এ কথা সে নিজেও অস্বীকার করে না। মাত্র কিছুদিন হল সে এ চাকরি পেয়েছে। সাব এডিটর হিসেবেই। তবু তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফিচার লিখতে দেওয়া হয় এবং গুরুতর ঘটনার রিপোর্টিং-এ পাঠানো হয়। ধৃতিকে যে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে অফিস তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ অফিসে ভাল ফিচার-লেখক এবং ঝানু রিপোর্টারের অভাব নেই।

প্রধানমন্ত্রী ময়দানে মিটিং সেরে রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বসবেন সন্ধে সাড়ে-ছ'টায়। এখনও তিনটে বাজেনি। ধৃতি সুতরাং আড্ডা মারতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সম্প্রতি কয়েকজন ট্রেনি জার্নালিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে। মোট চারজন। তারা প্রত্যেকেই স্কুল কলেজে দুর্দান্ত ছাত্র ছিল। বুধাদিত্য হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিল হিউম্যানিটিজে। নকশাল আন্দোলনে নেমে পড়ায় পরবর্তী রেজাল্ট তেমন ভাল নয়। রমেন স্টার পাওয়া ছেলে। এম এ-তে ইকনমিকস-এ প্রথম শ্রেণি। তুষার হায়ার সেকেন্ডারির সায়েন্স স্ট্রিমে শতকরা আটাত্তর নম্বর পেয়ে স্ট্যান্ড করেছিল। বি এসসি ফিজিক্স অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস। এম এসসি করছে। দেবাশিস দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষায় শতকরা একাশি পেয়ে পাশ করেছিল। বি এ এম এ-তে তেমন কিছু করতে পারেনি। চারজনের গায়েই স্কুল কলেজের গন্ধ, কারও ভাল করে দাড়ি গোঁফ পোক্ত হয়নি।

এদের মধ্যে রমেনকে একটু বেশি পছন্দ করে ধৃতি। ছেলেটি যেমন চালাক তেমনি গভীর। কথা কম বলে এবং সবসময়ে ওর মুখে একটা আনন্দময় উজ্জ্বলতা থাকে।

ধৃতি আজ রমেনকে একা টেবিলে কাজ করতে দেখে সামনে গিয়ে বসল।

কী হে ব্রাদার, কী হচ্ছে?

একটা রিপোর্ট লিখছি। কৃষিমন্ত্রীর ব্রিফিং।

ও বাবা. অতটা লিখছ কেন? অত বড় রিপোর্ট যাবে নাকি? ডেসকে গেলেই হয় ফেলে রাখবে, না হলে কেটে ছেঁটে সাত লাইন ছাপবে।

রমেন করুণ মুখে বলে, তা হলে না লিখলেই তো ভাল হত।

মন্ত্রীদের ব্রিফিং মানেই তো কিছু খোঁড়া অজুহাত। ওসব ছেপে আজকাল কেউ কাগজের মূল্যবান স্পেস নষ্ট করে না। খুব ছোট করে লেখো, নইলে বাদ চলে যাবে।

এই অবধি আমার মোটে চারটে খবর বেরিয়েছে। অথচ পঞ্চাশ-ষাটটা লিখতে হয়েছে।

এরকমই হয়। তবু তো তোমরা ফুল টাইম রিপোর্টার। যারা মফস্‌সলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাদের অবস্থা কত করুণ ভেবে দেখো। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে কত খবর লিখে পাঠাচ্ছে, বছরে বেরোয় একটা কি দুটো।

তা হলে আমাদের কভারেজে পাঠানোই বা কেন?

নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে যখন পাকাপোক্ত হবে, স্কুপ করতে শিখবে তখন তোমাকে নিয়েই হবে টানাটানি। যদি মানসিকতা তৈরি করে নিতে পারো তা হলে জার্নালিজম দারুণ কেরিয়ার।

তা জানি। আর সেইজন্যই লেগে আছি। আপনি কি আজ পি এম-এর রাজভবনের মিটিং কভার করছেন?

হুঁ। আমি অবশ্য আলাদা ইনভিটেশনও পেয়েছি।

রমেন একটু হেসে বলে, আশ্চর্যের বিষয় হল, আমিও পেয়েছি।

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তুমিও পেয়েছ! বলোনি তো!

চান্স পাইনি। আজ সকালেই লালবাজার থেকে বাড়িতে এসে দিয়ে গেল। আসলে কী জানেন, আমি একসময়ে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করতাম, কবিতাও লিখতাম, সেই সূত্র ধরে আমাকেও ডেকেছে।

এখন লেখো না?

লিখি। অল্প স্বল্প। গত মাসেই দেশ-এ আমার কবিতা ছিল।

বটে।—ধৃতি খুশি হয়ে বলে, মনে পড়েছে। আমি দেশ খুলেই আগে কবিতার পাতা পড়ে ফেলি। রমেন সেন তুমিই তা হলে!

অত অবাক হবেন না। আমার মতো কবি বাংলাদেশে কয়েক হাজার আছে।

তা থাক না। কবি কয়েক হাজার আছে বলেই কি তোমার দাম কমে যাবে?

ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর নিয়ম তো তাই বলে। কবিতার ডিমান্ড নেই, কিন্তু সাপ্লাই অঢেল। প্রাইস ফল করতে বাধ্য।

ইকনমিকসের নিয়ম কি আর্টে প্রযোজ্য?

খানিকটা তো বটেই। কবিতা লিখি বলে ক'জন আমাকে চেনে?

ধৃতি একটু হেসে বলে, একটা মনের মতো কবিতা লিখে তুমি যে আনন্দ পাও তা অকবিরা ক'জন পায়?

রমেনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হল। উষ্ণ কণ্ঠে বলল, কবিতা লিখে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। এত আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই।

তবে! দামটা সেইদিক দিয়ে বিচার কোরো। খ্যাতি বা অর্থ দিয়ে তা মাপাই যায় না। যাক গে, যাচ্ছ তো রাজভবনে?

যাব। বড্ড ভয় করে। কী হবে গিয়ে?

চলোই না। আর কিছু না হোক, রাজভবনের ইন্টিরিয়রটা তো দেখা হবে।

তা বটে। ঠিক আছে, যাব।

কাগজ কলম নিয়ে যেয়ো। যা দেখবে বা শুনবে তার নোট নিয়ো।

আমি নোট নেব কেন? কী হবে? রিপোর্ট তো করবেন আপনি।

তাতে কী? আমি যা মিস করব তুমি হয়তো তা করবে না। দু'জনের রিপোর্ট মিলিয়ে নিয়ে করলে জিনিসটা ভাল দাঁড়াবে।

মাথা নেড়ে রমেন বলল, ঠিক আছে।

ডেসক থেকে বিমান হাত উঁচু করে ডাকল, ধৃতি! এই ধৃতি! তোর টেলিফোন।

ধৃতি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, ধৃতি বলছি।

আমি বলছি।

কে বলছেন?

গলা শুনে চিনতে পারছেন না? আমি টুপুর মা।

ধৃতি একটু স্তব্ধ থেকে বলল, আপনি এখনও কলকাতায় আছেন?

মাইথন থেকে ঘুরে এলাম।

সেখানে কোনও খবর পেলেন?

না। কেউ কিছু বলতে চায় না। তবে আমার মনে হয় ওরা সবাই জানে যে টুপু খুন হয়েছিল।

ওরা মানে কারা?

ওখানকার লোকেরা।

কী বলছে তারা?

কিছুই বলছে না, আমি অনেককে টুপুর কথা জিজ্ঞেস করেছি।

শুনুন, আপনি এলাহাবাদে ফিরে যান। এভাবে ঘুরে ঘুরে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

একেবারে যে পারিনি তা নয়। একজন বুড়ো লোক স্বীকার করেছে যে সে টুপুকে বা টুপুর মতো একটি মেয়েকে দেখেছে।

টুপুর মতো মেয়ে কি আর নেই? ভুলও তো হতে পারে!

পারেই তো। সেইজন্য আমি ফিফটি পারসেন্ট ধরছি। টুপুর ঘাড়ের দিকে বাঁ ধারে একটা জরুল আছে। সেটাই ওর আইডেনটিটি মার্ক। বুড়োটাকে সেই জরুলের কথা বলেছিলাম। সে বলল, হ্যাঁ, ওরকম জরুল সেও মেয়েটির ঘাড়ে দেখেছে। এতটা মিলে যাওয়ার পরও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিই কী করে বলুন!

তা বটে।

টুপুর সঙ্গে একজন লোককেও দেখেছে বুড়োটা। খুব দশাসই চেহারা। বিশাল লম্বা। লোকটা নাকি টুপুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল।

বুড়োটা কে?

একজন ফুলওয়ালা। টুপু লোকটার কাছ থেকে ফুল কিনেছিল।

ধৃতি একটু ঘামছিল উত্তেজনায়, ভয়ে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নির্বিকার রেখে সে বলল, ঠিক আছে, শুনে রাখলাম। কিন্তু আমি একজন সামান্য সাব-এডিটর। টুপুর ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারছি না। যা করার পুলিশই করবে।

টেলিফোনে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। টুপুর মা বলল, এখন তো ইমার্জেন্সি চলছে, তাই পুলিশ খুব এলার্ট। কিন্তু কেন যেন টুপুর ব্যাপারে তারা তেমন ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না। এমনকী খুনটা পর্যন্ত বিশ্বাস করছে না।

বিশ্বাস করাটা নির্ভর করে এভিডেন্সের ওপর। আপনি আপনার মেয়ের খুনের কোনও এভিডেন্সই যে দিতে পারছেন না।

মায়ের মন সব টের পায়।

কিন্তু পুলিশ তো আর মা নয়?

ঠিক আছে, আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। কিন্তু কখনও-সখনও দরকার হলে ফোন করব। বিরক্ত হবেন না তো!

না, বিরক্ত হব কেন?

আমি খবরের কাগজের অফিস কখনও দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একদিন যদি আপনার অফিসে গিয়ে হাজির হই তো দেখাবেন? যদি অসুবিধে না থাকে?

নিশ্চয়ই। কবে আসবেন?

এ যাত্রায় হবে না। এলাহাবাদে আমার অনেক সম্পত্তি। সব পরের ভরসায় ফেলে এসেছি। শিগগিরই ফিরতে হচ্ছে। তবে আমি প্রায়ই কলকাতায় আসি।

বেশ তো, যখন সুবিধে হবে আসবেন।

বিরক্ত হবেন না তো!

না, এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আজ ছাড়ি তা হলে?

আপনার বুঝি খুব কাজ অফিসে?

কাজ না করলে মাইনে দেবে কেন বলুন?

আজ আপনার কী কাজ?

আজ প্রাইম মিনিস্টারের একটা মিটিং কভার করতে হবে।

ওমা! প্রাইম মিনিস্টার? আপনারা কত ভাগ্যবান! কোথায় মিটিং বলুন তো।

রাজভবনে।

ইস্, কী দারুণ! আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবেন?

বলব হয়তো।

ভয় করবে না?

ভয় কীসের? পি এম নিজেই তো মিটিং ডেকেছেন। আমাদের কথা শুনবার জন্যই।

কী বলবেন?

ঠিক করিনি। কথা জুগিয়ে যাবে।

একটা কথা পি এমকে বলবেন?

কী কথা?

বলবেন এ দেশে মেয়েদের বড় কষ্ট।

উনি নিজেও তো মেয়ে। উনি কি আর ভারতবর্ষের মেয়েদের কথা জানেন না?

জানেন। উনি সব জানেন। এ দেশের মেয়েরা ওঁর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছে। তবু আপনি তো পুরুষ মানুষ, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের কষ্টের কথা শুনলে উনি খুশি হবেন।

ওঁকে খুশি করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়।

টুপুর মা একটু চুপ করে থেকে বলে, তা ঠিক। তবে কী জানেন, ওঁকে খুশি করতে কেউ চায় না, সবাই শুধু ওঁর দোষটাই দেখে। পি এম একজন মহিলা বলেই কি আপনারা পুরুষেরা ওঁকে সহ্য করতে পারেন না?

তা কেন? পি এম মহিলা না পুরুষ সেটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। আমরা দেখব ওঁর কাজ।

আমার মনে হয় পুরুষেরা ওঁকে হিংসে করে।

তা হলে পি এম পুরুষদের ভোটই পেতেন না। আপনি ভুল করছেন। এ দেশের লোকেরা ইন্দিরা গাঁধীকে মায়ের মতোই দেখে।

বলছেন! কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। দেশটা একটু ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন।

তা অবশ্য ঠিক। আমি দেশের কতটুকুই বা দেখেছি! কলকাতা আর এলাহাবাদ। আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, না?

খুব না হলেও কিছু ঘুরেছি, আর লোকের সঙ্গেও মিশি। আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারি।

জানেন আমাদের এলাহাবাদের হাইকোর্টেই ওঁর মামলাটা হচ্ছিল, আমরা তখন প্রায়ই কোর্টে যেতাম। কী থ্রিলিং! তারপর উনি যখন হেরে গেলেন, কী মন খারাপ!

হতেই পারে। আপনি খুব ইন্দিরা-ভক্ত।

তা বলতে পারেন। আমি ওঁর ভীষণ ভক্ত। আপনি নন?

আমি! আমার কারও ভক্ত হলে চলে না।

ইন্দিরা এলাহাবাদের মেয়ে জানেন তো! আমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের আনন্দ ভবন বেশি দূরেও নয়। ছাদে উঠলে দেখা যায়। আপনি তো গেছেন এলাহাবাদে, তাই না?

হ্যাঁ, তবে খুব ভাল করে শহরটা দেখিনি।

এবার গেলে দেখে আসবেন। খুব সুন্দর শহর।

আচ্ছা দেখব।

আর একটা কথা।

বলুন।

আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের।

তেমন কিছু নয়।

বলছিলাম কী, আমাকে দয়া করে পাগল ভাববেন না।

ভেবেছি নাকি?

হয়তো ভেবেছেন। ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। সেই এলাহাবাদ থেকে মাঝরাতে ট্রাঙ্ককল করা, তারপর মাঝে মাঝেই এইভাবে টেলিফোনে উত্ত্যক্ত করা, তার ওপর টুপুর ঘটনা নিয়ে উটকো দায় চাপানো, আমি জানি আমার আচরণ খুব অদ্ভুত হচ্ছে। তবু আমি কিন্তু পাগল নই।

আপনি যা করেছেন তা স্বাভাবিক অবস্থায় তো করেননি।

ঠিক তাই। শোকে তাপে অস্থির হয়ে কী করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

আমি আপনাকে পাগল ভাবিনি। কিন্তু আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। টুপুর বাবা কোথায়?

ওমা! বলিনি আপনাকে?

বলেছিলেন। তবে বোধহয় ভুলে গেছি।

আমার স্বামী বেঁচে থেকেও নেই।

তার মানে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপুর মা বলে, মানে বুঝে আর কাজ নেই। আমার স্বামী ভাল লোক নন। তবে বড়লোকের ছেলে, তাই তাঁকে সবই মানিয়ে যায়।

তিনি এখন কোথায়?

যতদূর জানি বম্বেতে। একটি কচি মেয়ের সঙ্গে থাকেন।

তিনি বেঁচে থাকতে আপনি তাঁর সম্পত্তি পেলেন কী করে?

তাঁর সম্পত্তি পেলাম শাশুড়ি সেইরকম বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছিলেন বলেই। তাছাড়া আমার বাপের বাড়িও খুব ফেলনা ছিল না। সেদিক থেকেও কিছু পেয়েছি।

মাপ করবেন, এসব প্রশ্ন করা বোধহয় ঠিক হল না।

টুপুর মা একটু হাসলেন, আমাকে যে-কোনও প্রশ্নই করতে পারেন। আমার আর অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। শোকে তাপে জ্বালায় আমি এখন কেমন একরকম হয়ে গেছি। আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। ছাড়ছি।

আচ্ছা।

ধৃতি টেলিফোন রেখে দিল। তার ভ্রু একটু কোঁচকানো। মুখ চিন্তান্বিত।

নিউজ এডিটর ডেসকের সামনে দিয়ে একপাক ঘুরে যাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ধৃতি, আজ তো তুমি পি এম-এর রাজভবন মিটিং কভার করবে।

হ্যাঁ।

কোনও পলিটিক্যাল ইস্যু তুলো না কিন্তু। মোটামুটি ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রবলেমের ওপর প্রশ্ন করতে পারো। ইমার্জেন্সি নিয়েও কিছু বলতে যেয়ো না।

না, ওসব বলব না।

আমাদের কাগজের ওপর রুলিং পার্টি খুব সন্তুষ্ট নয়। টেক-ওভারের কথাও উঠেছিল। সাবধানে এগিয়ো।

ঠিক আছে।

ইয়ং রাইটারদের কাকে কাকে চেনো?

কয়েকজনকে চিনি।

তা হলে তো ভালই। পি এমকে কী জিজ্ঞেস করবে বলে ঠিক করেছ?

ধৃতি মৃদু হেসে বলে, দেখি।

প্রধানমন্ত্রীকে ধৃতির অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে। যেমন, আপনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভালই করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনী মামলায় হেরে যাওয়ার পর করলেন কেন? এতে আপনার ইমেজ নষ্ট হল না? কিংবা বিরোধীরা কোনও রাজ্যে সরকার গড়লেই কেন্দ্র তার পিছনে লাগে কেন? কেনই বা নানা উপায়ে সেই সরকারকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে? আপনার কি মনে হয় না যে এতে সেই রাজ্যের ভোটাররা অপমানিত বোধ করতে থাকে এবং ফলে দ্বিগুণ সম্ভাবনা থেকে যায় ফের ওই রাজ্যে বিরোধীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার? কিংবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যখন আপনার ভাবমূর্তি অতি উজ্জ্বল, যখন স্বতস্ফূর্ত ভোটের বন্যায় আপনি অনায়াসে ভেসে যেতে পারতেন তখন বাহাত্তরের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক রিগিং হয় তার কোনও দরকার ছিল কি? আপনি এমনিতেই বিপুল ভোট পেতেন, তবু রিগিং করে এখানকার ভোটারদের অকারণে চটিয়ে দেওয়া কি অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়? কিংবা আপনি যেমন ব্যক্তিত্বে, ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে অতীব উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মানুষ, আপনার

আশেপাশে বা কাছাকাছি তেমন একজনও নেই কেন? আপনার দলের সকলেই কেন আপনারই মুখাপেক্ষী, আপনারই করুণাভিক্ষু? কেন আপনার দলে তৈরি হচ্ছে না পরবর্তী নেতৃবৃন্দের সেকেন্ড লাইন অফ লিডারশিপ?

কিন্তু এসব প্রশ্ন করা যাবে না। ধৃতি জানে, এই জরুরি অবস্থায় এসব প্রশ্ন করা বিপজ্জনক। তাছাড়া এই চা-চক্রটি নিতান্তই বুদ্ধিজীবীদের। এখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক কথাই উঠতে পারে।

নিউজ এডিটর বললেন, একটু সাবধানে প্রশ্ন-টশ্ন কোরো। আর ওয়াচ কোরো কোন কবি সাহিত্যিক কী জিজ্ঞেস করেন।

ধৃতি একটু হেসে বলে, কবি সাহিত্যিকদের আমি জানি। তারা খুব সেয়ানা লোক। কোনও বিপজ্জনক প্রশ্ন তারা করবে না।

সে তো জানি। তবু ওয়াচ কোরো। আর দরকার হলে গাড়ি নিয়ে যেয়ো। মোটর ভেহিকেলসে তোমার নামে গাড়ি বুক করা আছে।

দরকার নেই।

নেই? তা হলে ঠিক আছে।

মোটর ভেহিকিলসের গাড়ি নেওয়ার ঝক্কি অনেক। এই অফিসের সবচেয়ে কুখ্যাত বিভাগ হচ্ছে ওই মোটর ভেহিকিলস, গাড়ি মানেই চুরি। পার্টস, পেট্রল, টায়ার। এই কারণে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলি তিতিবিরক্ত হয়ে নিজস্ব মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট তুলেই দিচ্ছে। দিয়ে বাইরের গাড়ি ভাড়া করে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃতি কয়েকবারই অফিসের কাজে গাড়ি নিয়েছে। নিতে গিয়ে দেখেছে গাড়ির ইনচার্জ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে, দয়া করার মতো গাড়ি দেয়, গাড়ির ড্রাইভারও ভদ্র ব্যবহার করে না, সব জায়গায় যেতে চায় না। বলতে গেলে মহাভারত। তাই ধৃতি অফিসের গাড়ি পারতপক্ষে নেয় না। আজও নেবে না।

পাঁচটার পর ধৃতি আর রমেন বেরোল।

রাজভবনের ফটকে কড়া পাহারা। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কার্ড দেখাতেই ফটকের পুলিশ অফিসার উলটেপালটে দেখে বলল, যান।

দু'জনে ভিতরে ঢুকতেই আবার পুলিশ ধরল এবং আবার কার্ড দেখাতে হল। এবং আবার এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মিলল।

রমেন নিচুস্বরে বলল, ধৃতিদা!

বলো।

বেশ ভয় ভয় করছে।

কেন বলো তো!

আপনার করছে না?

নাঃ। এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভয় কীসের? আমিও গণ তিনিও গণ।

রমেন একটু হেসে বলে, পুলিশ তা মনে করে না।

তা অবশ্য ঠিক। তবে সিকিউরিটির ব্যবস্থা স্টেট গভর্নমেন্টই করেছে। পি এম-এর কিছু হলে সরকারের বদনাম।

রমেন মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, রাজভবনের ভিতরের এই রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন তা জানেন?

এমনি। পেবলের রাস্তা আরও কত জায়গায় আছে। বেশ লাগে।

রমেন মাথা নেড়ে বলল, না। এর একটা অন্য কারণও আছে।

তাই নাকি?

আমার কাকা পুলিশে চাকরি করতেন। বিগ অফিসার ছিলেন। নাম বললেই হয়তো চিনে ফেলবেন, তাই আপাতত নাম বলছি না। যখন চৌ এন লাই কলকাতায় এসে রাজভবনে ছিলেন তখন কাকা ছিলেন তাঁর সিকিউরিটি ইনচার্জ। তিনিই কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের রাজভবনের রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন।

তোমার কাকা কী বলেছিলেন?

আপনার মতোই সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন। চৌ এন লাই খুব মজার হাসি হেসে বলেছিলেন, মোটেই তা নয়। নুড়িপাথরের ওপর গাড়ি চললে শব্দ হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে লাটসাহেবদের সিকিউরিটির জন্যই ওই ব্যবস্থা। তারপর চৌন এন লাই কাকাকে একটা গাড়ির শব্দ শোনালেন। শুনিয়ে বললেন, নাউ ইউ সি দ্যাট অন এ পেবল রোড দি সাউন্ড অফ এ কার কামিং অর গোয়িং ক্যানট বি সাপ্রেসড!

ধৃতি হেসে বলল, তাই হবে। সাহেবদের খুব বুদ্ধি ছিল।

চৌ এন লাইয়েরও কম ছিল না। আমার কাকা পুলিশ হয়েও যেটা বুঝতে পারেননি উনি ঠিক পেরেছিলেন।

সিঁড়ির মুখে আর এক দফা বাধা ডিঙিয়ে যখন লাউঞ্জে ঢুকল তারা, তখন সেখানে ভীরু ও সংকুচিত মুখে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ও আর্টিস্ট জড়ো হয়েছে। রাজভবনের কালো প্রাচীন লিফটের সামনে বেশ একখানা ছোটখাটো ভিড়। এদের অনেককেই ধৃতি চেনে, রমেনও।

কয়েক ব্যাচ লিফট-বাহিত হয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার পরই ধৃতি আর রমেনের পালা এল। লিফটম্যান সাফ জানিয়ে দিল, দোতলায় মিটিং বটে কিন্তু লিফট খারাপ বলে দোতলায় থামছে না। তিনতলায় উঠে দোতলায় নামতে হবে।

ধৃতি লিফটের ব্যাপারটা মনে মনে নোট করল। খরচের ওপর এখন কড়া সেনসর। কাজেই রাজভবনের লিফট ত্রুটিযুক্ত এ খবরটা লেখা হলেও ছাপা যাবে কি না এতে ঘোর সন্দেহ।

তিনতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দু'জনে কিছু আতান্তরে পড়ে গেল। লিফটের সামনে সংকীর্ণ করিডোরে নেমে কোনদিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে সকলেই গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খেতেও কেউ সাহস করছে না। ফিসফাস কথা বলছে শুধু।

সেই ভিড়ে ধৃতি আর রমেনও দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন সকলেই খানিকটা উসখুস করছে তখনই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং তরুণ এক মিলিটারি অফিসার করিডোরে ঢুকেই হাত নেড়ে সবাইকে প্রায় গোরু তাড়ানোর মতো করে নিয়ে তুলল দক্ষিণের প্রকাণ্ড বারান্দায়।

বারান্দার পরেই একখানা হলঘর। তাতে মস্ত মস্ত টেবিল পাতা। টেবিলে খাবার সাজানো থরে থরে। উর্দিপরা বেয়ারা ছাড়া সে ঘরে কেউ নেই। বোঝা গেল এই ঘরেই ইন্দিরার সঙ্গে তারা সবাই চা খাবে। তবে আপাতত প্রবেশাধিকার নেই। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় কয়েকজন সিগারেট ধরাল। কে এসে চুপি চুপি খবর দিল। ময়দানের মিটিং শেষ হয়েছে। ইন্দিরা রাজভবনে রওনা হয়েছেন। সকলেই কেমন যেন উদ্বিগ্ন, অসহজ, অপ্রতিভ। যারা জড়ো হয়েছে তারা সবাই কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক বটে, কিন্তু সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। রাজভবনে আসা বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাদের জীবনে খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়। তার ওপর জরুরি অবস্থার একটা গা ছমছমে ব্যাপার তো আছেই।

খুবই আকস্মিকভাবে একটা চঞ্চলতা বয়ে গেল ভিড়ের ভিতর দিয়ে।

এলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। স্মার্ট চেহারা, মুখে সপ্রতিভ হাসি, হাতজোড়।

বললেন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন তো! আসুন আসুন, এ ঘরে আসুন।

আবহাওয়াটা কিছু সহজ হয়ে গেল। হাত পায়ে সাড় এল যেন সকলের।

হলঘরে ঢুকে ভাল করে থিতু হওয়ার আগেই ধৃতি অবিশ্বাসের চোখে দেখল, ইন্দিরা ঘরে ঢুকছেন।

সে কখনও ইন্দিরা গাঁধীকে এত কাছ থেকে দেখেনি। দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। ছবিতে যেরকম দেখায় মোটেই সেরকম নন ইন্দিরা। ছোটখাটো ছিপছিপে কিশোরীপ্রতিম তাঁর শরীরের গঠন। গায়ের রং বিশুদ্ধ গোলাপি। মুখে সামান্য পথশ্রমের ছাপ আছে। কিন্তু হাসিটি অমলিন।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকেই আবহাওয়াটা আরও সহজ করে দিলেন। ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। সঙ্গে ঘুরছেন রাজ্যপাল ডায়াসের পত্নী।

ধৃতি প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ ইন্দিরা তার মুখোমুখি এসে গেলেন।

ধৃতি চিন্তা না করেই হঠাৎ ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, আপনি কবিতা গল্প উপন্যাস পড়েন?

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইন্দিরা বললেন, সময় তো আমার খুব কমই হাতে থাকে। তবু পড়ি। আমি পড়তে ভালবাসি।

কীরকম লেখা আপনার ভাল লাগে?

একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হতাশাব্যঞ্জক কিছুই আমার পছন্দ নয়, জীবনের অস্তিবাচক দিক নিয়ে লেখা আমি পছন্দ করি।

মহান ট্র্যাজেডিগুলো আপনার কেমন লাগে?

যা মহান তা তো ভাল বলেই মহান।

আর সুযোগ হল না। আর একজন এসে মৃদু ঠেলায় সরিয়ে দিল ধৃতিকে।

ধৃতি সরে এল।

ইন্দিরা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। থাক করা প্লেট থেকে একটা-দুটো তুলে দিলেন অভ্যাগতদের হাতে। ধৃতি সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন যে ইন্দিরার হাত থেকে প্লেট নিতে পারল। প্লেটটা নিয়েই সে মৃদু স্বরে বলল, ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমি আপনার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দরী মহিলা জীবনে দেখিনি। সুন্দরীরা সাধারণত বোকা হয়।

ইন্দিরা তার এই দুঃসাহসিক মন্তব্যে রাগ করলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, জীবনে কোনও লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

চমৎকার কথা। ধৃতি মনে মনে কথাটা টুকে রাখল।

রাজভবনের জলখাবার কেমন তা সাংবাদিক হিসেবেই লক্ষ করছিল ধৃতি। খুব যে উঁচুমানের তা নয়। মোটামুটি খেয়ে নেওয়া যায়। খারাপ নয়, এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। তবে ইন্দিরা গাঁধীও এই খাবার মুখে দিচ্ছেন, এইটুকুই যা বলার কথা।

রমেন একটা প্যান্টি কামড়ে ধৃতিকে নিচু স্বরে বলল, পি এম-কে আমার হয়ে একটা প্রশ্ন করবেন?

কী প্রশ্ন?

উনি কবিতা পড়েন কি না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমি অলরেডি অনেক বাচালতা করে ফেলেছি। এবার তুমি করো।

ও বাবা, আমার ভয় করে।

ভয়! ইন্দিরাজিকে ভয়ের কী?

আপনার গাটস আছে, আমার নেই।

গাটস নয়। আমি জানি ইন্দিরাজি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। ওঁর একটা দারুণ কালচারাল

ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যা পলিটিক্যাল দলবাজিতে মার খায়নি। উনি হিউমার বোঝেন, আর্ট ভালবাসেন, সৌন্দর্যবোধ আছে, যা পলিটিক্সওয়ালাদের অধিকাংশেরই নেই। এই মানুষকে যদি ভয় পেতে হয় তো পাবে ওঁর প্রতিপক্ষরা, আমরা পাব কেন?

আপনি কি একটু ইন্দিরা-ভক্ত, ধৃতিদা?

আমি তো পলিটিক্স বুঝি না, কিন্তু মানুষ হিসেবে এই মহিলাকে আমার দারুণ ভাল লাগে। তবে তোমার প্রশ্নের জবাবে আমিই বলে দিতে পারি, ইন্দিরাজি কবিতা না ভালবেসেই পারেন না। ওঁকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পড়ে গেল দু'জন। মুখ্যমন্ত্রী রায় সকলকেই বদান্যভাবে স্মিতহাসি বিতরণ করছিলেন। ধৃতির দিকে চেয়ে সেই হাসিমাখা মুখেই বললেন, চা খেয়েই হলঘরে চলে যাবেন, কেমন?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

হলঘরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গ্যালারির মতো। ডায়াসে পাঁচখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ইন্দিরা, রাজ্যপাল ডায়াস ও তাঁর স্ত্রী, সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধিজীবীরা একে একে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। নাম, কী লেখেন বা আঁকেন ইত্যাদি। ইংরিজি বা হিন্দিতে। ধৃতি দ্রুত নোট নিতে নিতেই নিজের পালা এলে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে নিল।

ধৃতি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। প্রত্যেকেই আড়ষ্ট, নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত এবং কেউই আজকের আলোচনায় প্রাধান্য চায় না। সবকিছুরই মূলে রয়েছে ইমার্জেন্সি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যা একটি অভূতপূর্ব জুজুর ভয়। ইউ পি-তে নাসবন্দির কথা শোনা যাচ্ছে, দিল্লিতে বস্তি এবং বসত উচ্ছেদের কথা কানাকানি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস সঞ্জয় গাঁধী ও তাঁর অত্যুৎসাহী সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীরাও ভীত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা ততোধিক। বিরোধী নেতাদের অনেকেই কারাগারে, ঠোঁটকাটা কতিপয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও অনুরূপ রাজরোষের শিকার। আর সবকিছুর মূলে যিনি, সেই অখণ্ড কর্তৃত্বময়ী নারী এখন ধৃতির চোখের সামনে ওই বসে আছেন। কিন্তু ধৃতি কিছুতেই মহিলাকে অপছন্দ করতে পারছিল না। একটু অস্বস্তি তারও আছে ঠিকই, কিন্তু এই মহিলার মানবিক আকর্ষণটাও তো কম নয়। এঁকে সে ডাইনি ভাববে কী করে?

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পর দু'-চারজন উঠে একে একে ভয়ে ভয়ে দু'-চার কথা বলল। তেমন কোনও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। কেউ বলল, লেখক ও কবিদের জন্য একটা স্টুডিয়ো করে দেওয়া হোক। কারও প্রস্তাব, সরকার তাদের গ্রন্থ প্রকাশে কিছু সাহায্য করুক। এইরকম সব এলেবেলে কথা।

ইন্দিরা সাধ্যমতো জবাব দিলেন। কিছু জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীও। তবে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না।

সবশেষে ইন্দিরা দু'-চারটে কথা খুব শান্ত গলায় বললেন। প্রধান কথাটা হল, এখন নিরাশার সময় নয়। নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। শিল্পে বা সাহিত্যেও কিছু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত এবং কিছু স্বতঃপ্রণোদিত দায়িত্ববোধও।

সবাই খুশি। তেমন কোনও ওপর-চাপান দেননি ইন্দিরা, শাসন করেননি, ভয় দেখাননি। স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল সবাই। জরুরি অবস্থায় শুধু একটু সামলে লিখতে বা আঁকতে হবে।

ধৃতি জানে, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশেরই কোনও রাজনৈতিক বোধ বা দলগত পক্ষপাতিত্ব নেই। রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতার চাষ তাঁরা বেশিরভাগই করেন না। একমাত্র বামপন্থী

লেখক কবি বা শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় তেমন বেশি নন।

তাছাড়া বামপন্থী বা মার্কসীয় সাহিত্য বাংলায় তেমন সফলও হয়নি। সুতরাং তাঁদের কথা না ধরলেও হয়। বাদবাকিরা রাজনীতিমুক্ত বুদ্ধিজীবী। রাজনীতির দলীয় কোন্দল থেকে তাঁদের বাস বহুদূরে। সেটা ভাল না মন্দ সে বিচার ভিন্ন। তবে এই জরুরি অবস্থার দরুন তাঁরা কেউ আতঙ্কিত নন। কিন্তু অস্বস্তি একটা থাকেই। সেই অস্বস্তি ইন্দিরা আজ কাটিয়ে দিলেন।

অফিসে এসে রিপোর্ট লিখতে ধৃতির ন'টা বেজে গেল। কপিটা নিউজ এডিটরের টেবিলে গিয়ে রেখে সে বলল, শরীরটা ভাল লাগছে না। যাচ্ছি।

শরীর ভাল নেই তো অফিসের গাড়ি নিয়ে যাও। বলে দিচ্ছি।

না, চলে যেতে পারব।

তা হলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দেখছি। রিপোর্টটা আপনি যতক্ষণ পড়বেন ততক্ষণ অপেক্ষা করব কি?

না, তার দরকার নেই। কিছু অদলবদল দরকার হলে আমিই করে নিতে পারব। সেনসর থেকে আগে ঘুরে আসুক তো।

ধৃতি বেরিয়ে এল। কাউকে সঙ্গে নিল না। রাস্তায় একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। আর ট্যাকসিতে বসেই বুঝতে পারল তার প্রবল জ্বর আসছে। জ্বরের এই লক্ষণ ধৃতি খুব ভাল চেনে। ছাত্রাবস্থা থেকেই হোটেলে মেসে এবং রেস্তোরাঁয় আজেবাজে খেয়ে তার পেটে একটা বায়ুর উপসর্গ দেখা দিয়েছে। যখনই উপসর্গটা দেখা দেয় তখনই তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে যায় একশো তিন চার ডিগ্রি। এক ডাক্তার বন্ধু একবার বলেছিল, তোর জ্বর হলে পেটের চিকিৎসা করাবি, জ্বর সেরে যাবে।

এ জ্বরটা সেই জ্বর কি না বুঝতে পারছিল না সে। তবে যখন বাসার সামনে এসে নামল তখন সে টলছে এবং চোখে ঘোর দেখছে।

নিতান্তই ইচ্ছাশক্তির জোরে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে চেষ্টা করল। থেমে থেমে, দম নিয়ে নিয়ে। পরমা বাসায় আছে তো! যদি না থাকে তবে একটু বিপাকে পড়তে হবে তাকে।

দোতলা অবধি উঠে তিনতলার সিঁড়িতে পা রেখে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধৃতি। মাথাটা বড্ড টলমল করছে।

কী হয়েছে আপনার?

ধৃতি আবছা দেখল, একটা মেয়ে, চেনা মুখ। এই ফ্ল্যাটবাড়িরই কোনও ফ্ল্যাটে থাকে। বেশ চেহারাখানা, বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি ঘন এবং গাঢ় শ্বাস ফেলছিল, শরীরটা বাস্তবিকই যে কতটা খারাপ তা এতক্ষণ সে টের পায়নি, এবার পাচ্ছে, তবু মর্যাদা বজায় রাখতে বলল, আমি পারব।

আপনার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

পারব। ও কিছু নয়।

সত্যিই পারবেন? আমার দাদা আর বাবা ঘরে আছে, তাদের ডাকি? ধরে নিয়ে ওপরে দিয়ে আসবে।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, পারব, একটু রেস্ট নিয়ে নিই তা হলেই হবে।

তবে আমাদের ফ্ল্যাটে বসে রেস্ট নিন। আমি পরমাদিকে খবর পাঠাচ্ছি।

সহৃদয় পুরুষ এবং সহৃদয়া মহিলার সংখ্যা আজকাল খুব কমে গেছে। আজকাল ফুটপাথে পড়ে-থাকা মানুষের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দায়িত্ব নিতে সকলেই ভয় পায়। মেয়েটির আন্তরিকতা তাই বেশ লাগছিল ধৃতির। সে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু দু' ধাপ সিঁড়ি নামতে গিয়েই মাথাটা একটা চক্কর দিয়ে ভোম হয়ে গেল। তারপরই চোখের

সামনে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। ধৃতি একবার হাত বাড়াল শেষ চেষ্টায় কিছু ধরে পতনটা সামলানোর জন্য। কিন্তু হথাই। নিজের শরীরের ধমাস করে শানে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনতে পেল ধৃতি। তারপর আর জ্ঞান রইল না।

যখন চোখ চাইল তখন পরমা তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগ।

ধৃতি চোখ মেলতেই পরমা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে? একটু ভাল?

ধৃতি পূর্বাপর ঘটনাটা মনে করতে পারল না। শুধু মনে পড়ল, সিঁড়ির ধাপে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। শরীরটা আগে থেকেই দুর্বল লাগছিল তার। শরীরে জ্বর। কিন্তু এই জ্বর তার হয় পেটের গোলমাল থেকে। দীর্ঘকাল মেসে হোটেলে খেয়ে তার একটা বিশ্রী রকমের অম্বলের অসুখ হয়। এখনও পুরোপুরি সারেনি। সেই চোরা অম্বল থেকে পেটে গ্যাস জমে মাঝে মাঝে জ্বর হয় তার। আর এই অবস্থায় শরীর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।

ধৃতি পরমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ, না?

ভয় হবে না! কীভাবে পড়ে গিয়েছিলেন! ওরা সব ধরাধরি করে যখন নিয়ে এল তখন তো আমি সেই দৃশ্য দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার এসে বলে গেল, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

ধৃতি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, ভয় পেয়ো না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়।

জ্বর হতেই পারে। কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কেন?

ধৃতি ফের একটু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই মেয়েটাকে দেখেই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

যাঃ! ইয়ারকি হচ্ছে?

কেন, মেয়েটা সুন্দর নয়?

সুন্দর নয় তো বলিনি। তবে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয় মোটেই। পৃথাকে আপনি বহুবার দেখেছেন।

ধৃতির আর ইয়ারকি দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

শুনছেন? ডাক্তার আপনাকে গরম দুধবার্লি খাইয়ে দিতে বলে গেছেন।

দুধ-বার্লি আমি জীবনে খাইনি। ওয়াক।

অসুখ হলে লোকে তবে কী খায়?

ও আমি পারব না।

না খেলে দুর্বল লাগবে না?

পি এম-এর পার্টিতে খেয়েছি। খিদে নেই।

কী খাওয়াল ওখানে?

অনেক কিছু।

পি এম-কে দেখলেন?

দেখলাম।

আপনি ভাগ্যবান। আমাকে দেখালেন না তো? আচ্ছা আপনি ঘুমোন। একটু বাদে তুলে খাওয়াব।

ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে আর ডেকো না পরমা। একটানা কিছুক্ষণ ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাই কি হয়? খেতে হবে।

হবেই?

না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন।

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে ওপরে এনেছিল, না?

প্রায় সেইরকম? কেন বলুন তো।

আমিও বুঝতে পারছি না হঠাৎ একটা সুন্দর মেয়ের সামনে গাড়লের মতো আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন। বিশেষ করে মেয়েটা যখন ওদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

পরমা সামান্য হেসে বলে, অজ্ঞান কি কেউ ইচ্ছে করে হয়?

ইচ্ছাশক্তিও এক মস্ত শক্তি। ইচ্ছাশক্তি খাটাতে পারলে আমি কিছুতেই অজ্ঞান হতাম না।

এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কেউ তো আর কিছু বলেনি।

বলার দরকারও নেই। আমি শুধু ভাবছি আমার ইচ্ছাশক্তি এত কম কেন।

মোটেই কম নয়। আজ আপনার খুব ধকল গেছে। সেইজন্য।

ধৃতি একটু গুম হয়ে থেকে বলে, আচ্ছা কী খাওয়াবে খাইয়ে দাও। শোনো তোমাদের রাত্রে রুটি হয়নি?

হচ্ছে।

তাই দু'খানা নিয়ে এসো। সঙ্গে ডাল-ফাল যা হোক কিছু।

শঙ্কিত গলায় পরমা বলে, রুটি খেলে খারাপ হবে না তো?

আরে না। বার্লি-ফার্লি আমি কখনও খাই না। দুধও চুমুক দিয়ে খেতে পারি না। রুটিই আনো।

পরমা উঠে গেল।

ধৃতি চেয়ে রইল সিলিং-এর দিকে। বড় আলো নেভানো। ঘরে একটা কমজোরি বালবের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মাত্র। ধৃতি চেয়ে রইল। স্মরণকালের মধ্যে সে কখনও অজ্ঞান হয়নি। শরীর শত খারাপ হলেও না। তবে আজ তার এটা কী হল? ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হচ্ছে না তো তার? জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না তো?

নিজেকে নিয়ে ধৃতির চিন্তার শেষ নেই।

পরমা রুটি নিয়ে এল। দু'খানার বদলে ছ'খানা। ডাল, তরকারি, আলুভাজা, মাংস অবধি।

ও বাবা, এ যে ভোজের আয়োজন।

রুটিতে ঘি মাখিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ। আমার বারোটা তুমিই বাজাবে।

ওমা, আমি বারোটা বাজাব কী করে?

জ্বোরো রুগিকে কেউ ঘি খাওয়ায়?

রুটি শুকনো কেউ খায়?

ধৃতি একটু হাসল। পরমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। গ্রে ম্যাটার ওর মাথায় খুবই কম। তবে পরমা মেয়েটা বড় ভাল মানুষ। ধৃতি তাই খেতে শুরু করে দিল। কিন্তু বিস্বাদ মুখে তেমন কিছুই খেয়ে উঠতে পারল না। পরমার অনেক তাগিদ সত্ত্বেও না।

ওষুধ খেয়ে সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জ্বর-যন্ত্রণায় কাতর শরীরে নিপাট নিশ্ছিদ্র ঘুম হয় না। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘুমের চটকা ভেঙে চোখ চেয়েই সে পিপাসায় 'ওঃ' বলে শব্দ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন কাছে এল। একটা সুন্দর গন্ধ পেল ধৃতি। ঘুমজড়ানো চোখে অবাক হয়ে দেখল, পরমা।

তুমি! তুমি জেগে আছ কেন?

ওমা! আপনার এত জ্বর আর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোব?

ধৃতি ম্লান একটু হেসে বলে, বন্ধুপত্নী, তুমি বড়ই সরলা।

সরলা! হোয়াট ডু ইউ মিন? বোকা নয় তো!

বোকা ছাড়া আর কী বলা যায় বলো তো তোমাকে! একেই তো পর-পুরুষের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বসবাস করছ। তার ওপর আবার এক ঘরে এবং এত রাতে!

তাতে কী হয়েছে বলুন তো!

এখনও কিছু হয়নি বটে, তবে হতে কতক্ষণ। কথাটা বাইরে জানাজানি হলে যা একখানা নিন্দে হবে দেখো।

ঠোঁট উলটে পরমা বলে, হোক গে। তা বলে একশো চার জ্বরের একজন রুগিকে একা ঘরে ফেলে রাখতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, একটু জল দাও।

পরমা জল দেয় এবং ধৃতি শোয়ার পর তার কপালে জলে ভেজা ঠান্ডা করতলটি রেখে নরম স্বরে বলে, ঘুমোন, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার কাছে থাকব।

থাকার দরকার নেই। এবার গিয়ে ঘুমোও।

জ্বরটা আর একটু কমুক। তারপর যাব।

এত ভাবছ কেন বলো তো!

কী জানি কেন, তবে কারও অসুখ করলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। আপনাকে তো দেখার কেউ নেই।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তারও এ কথাটা মনে হয়। তার বাস্তবিকই কেউ নেই। দাদা দিদি এরা থেকেও অনাত্মীয়। তবে বয়সের গুণে এবং কাজকর্মের মধ্যে থাকার দরুন আত্মীয়হীনতা তাকে তেমন উদ্বিগ্ন করে না। বরং কেউ না থাকায় সে অনেকটাই স্বাধীন। তবু এইরকম অসুখ-বিসুখের সময় বা হঠাৎ ডিপ্রেশন এলে একাকিত্বটা সে বড় টের পায়।

পরমা কপালে একটা জলপটি লাগাল। বলল, মাথাটা একটু ধুয়ে দিতে পারলে হত।

এত রাতে আর ঝামেলায় যেয়ো না। আমি অনেকটা ভাল ফিল করছি।

একশো চার জ্বরে কেমন ভাল ফিল করে লোকে তা জানি।

তুমি সত্যিই জেগে থাকবে নাকি?

থাকব তো বলেছি।

ধৃতি পরমার দিকে তাকাল। আবছা আলোয় এক অদ্ভুত রহস্যময় সৌন্দর্য ভর করেছে পরমার শরীরে। এলো চুলে ঘেরা মুখখানা যে কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ধৃতি পরমার প্রতি কখনওই কোনও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি। আজও করল না। কিন্তু মেয়েটার প্রতি সে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত মায়া আর ভালবাসা টের পাচ্ছিল। জ্বরতপ্ত দু'খানা হাতে পরমার হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে ধৃতি বলল, তোমার মনটা যেন চিরকাল এরকমই থাকে পরমা। তুমি বড় ভাল।

হঠাৎ পরমার মুখখানা তার মুখের খুব কাছাকাছি সরে এল।

গাঢ়স্বরে পরমা বলল, আর কমপ্লিমেন্ট দিতে হবে না। এখন ঘুমোন।

ধৃতি ঘুমোল। এক ঘুমে ভোর।

জ্বরটা ছাড়লেও দিন দুই বেরোতে পারেনি ধৃতি। তিনদিনের দিন অফিসে গেল।

ফোনটা এল চারটে নাগাদ।

এ ক'দিন অফিসে আসেননি কেন? আমি রোজ আপনাকে ফোন করেছি।

ধৃতি একটু শিহরিত হল গলাটা শুনে। বলল, আমার জ্বর ছিল।

আপনার গলার স্বরটা একটু উইক শোনাচ্ছে বটে। যাই হোক, সেদিন পি এম-এর সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউয়ের রিপোর্ট কাগজে পড়েছি। বেশ লিখেছেন। কিন্তু আপনারা কেউই পি এম-কে তেমন অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি।

পি এম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁকে রংফুটে ফেলা কি সহজ?

তা বটে।

আপনি এখনও এলাহাবাদে ফিরে যাননি?

না। রোজই যাব যাব করি। কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে যায়। আবার ভাবি, গিয়েই বা কী হবে। টুপু নেই, ফাঁকা বাড়িতে একা একা সময়ও কাটে না ওখানে।

এখানে কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন?

এখানে! ও বাবাঃ, কলকাতায় কি সময় কাটানোর অসুবিধে? ছবির একজিবিশনে যাই, ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনি, থিয়েটার দেখি, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যাই, আর ঘুরে বেড়ানো বা মার্কেটিং তো আছেই।

হ্যাঁ, কলকাতা বেশ ইন্টারেস্টিং শহর।

আপনারও কি কলকাতা ভাল লাগে?

লাগে বোধহয়, ঠিক বুঝতে পারি না।

বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

আমার! আমার প্রায় কেউই নেই। এক বন্ধুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকি।

ওমা। বলেননি তো কখনও?

এটা বলার মতো কোনও খবর তো নয়।

আপনার মা বাবা নেই?

না।

ভাই বোন?

আছে, তবে না থাকার মতোই।

আপনি তা হলে খুব একা?

হ্যাঁ।

ঠিক আমার মতোই।

আপনার একাকিত্ব অন্যরকম। আমার অন্যরকম।

আচ্ছা, একটা প্রস্তাব দিলে কি রাগ করবেন?

রাগ করব কেন?

আমাদের বাড়িতে আজ বা কাল একবার আসুন না।

কী হবে এসে? টুপুর ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, কারওরই কিছু করার নেই বোধহয়। কিন্তু তাতে কী? আমি আপনার একটু সঙ্গ চাই। রাজি হবেন না?

না, রাজি হতে বাধা নেই। আচ্ছা যাব'খন।

ওরকম ভাসা-ভাসা বলা মানেই এড়িয়ে যাওয়া। আপনি কাল বিকেলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব।

কখন?

চারটে।

বিকেলে যে আমার অফিস।

কখন ছুটি হয় আপনার?

রাত ন'টা।

তা হলে সকালে আসুন। এখানেই দুপুরে খেয়ে অফিসে যাবেন।

ধৃতি হেসে ফেলে বলে, চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করে ফেলছেন। আমি কেমন লোক তাও তো জানেন না।

ওপাশে একটু হাসি শোনা গেল। টুপুর মা একটু বেশ তরল স্বরেই বলল, বরং বলুন না যে, আমি আপনার অচেনা বলেই ভয়টা বরং আপনার।

ধৃতি বলে, আমি ভবঘুরে লোক, আত্মীয়হীন, আমার বিশেষ ভয়ের কিছু নেই। পুরুষদের বেলায় বিপদ কম। মহিলাদের কথা আলাদা।

আপনার কিছুই তেমন জানি না বটে, চাক্ষুষও দেখিনি, কিন্তু পত্র-পত্রিকায় আপনার ফিচার পড়ে জানি যে আপনি খুব সৎ মানুষ।

ফিচার পড়ে? বাঃ, ফিচার থেকে কিছু বুঝি বোঝা যায়?

যায়। আপনি না বুঝলেও আমি বুঝি। ভুল আমার কমই হয়। আরও একটা কথা বলি। আপনার মতোই আমিও কিন্তু একা। আমার কেউ নেই বলতে গেলে। একা থাকি বলেই আমার নিরাপত্তার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। সামান্য কারণে অহেতুক ভয় বা সংকোচ করলে আমার চলে না। এবার বলুন আসবেন?

ঠিক আছে, যাব।

সকালেই তো?

খুব সকালে নয়। এগারোটা নাগাদ।

ঠিক আছে। ঠিকানাটা বলছি, টুকে নিন।

ঠিকানা নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর ধৃতি ভাবতে লাগল কাজটা ঠিক হল কি না, না, ঠিক হল না। তবে এই ভদ্রমহিলা আড়াল থেকে তাকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে আসছেন কিছুদিন হল। টুপু নামে এক ছায়াময়ীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক পরোক্ষ রহস্য। হয়তো মুখোমুখি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে সেই রহস্যের কুয়াশা খানিকটা কাটবে। তাই ধৃতি এই ঝুঁকিটুকু নিল। বিপদে যদি বা পড়ে তার তেমন ভয়ের কিছু নেই। বিপদ তেমন আছে বলেও মনে হচ্ছে না তার।

একটু অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে দিনটা কাটল ধৃতির। পত্রিকায় ফিচার লিখলে প্রচুর চিঠি আসে। ধৃতিরও এসেছে। মোট সাতখানা। সেগুলো অন্যদিন যেমন আগ্রহ নিয়ে পড়ে ধৃতি, আজ সেরকম আগ্রহ ছিল না। কয়েকটা খবর লিখল, আড্ডা মারল, চা খেল বারকয়েক, সবই অন্যমনস্কতার মধ্যে। শরীরটাও দুর্বল।

একটু আগেভাগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল ধৃতি। সাড়ে আটটায় ঘরে ফিরে এসে দেখে, পরমা দারুণ সেজে ডাইনিং টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে।

কী পরমা? তোমার পতিদেবটি ফিরেছে নাকি?

না তো! হঠাৎ কী দেখে মনে হল?

তোমার সাজ আর ব্যস্ততা দেখে।

খুব ডিটেকশন শিখেছেন।

তবে আজ এত সাজের কী হল?

বাঃ, সাজটাই বা কী করেছি! মুগার শাড়িটা অনেককাল পরি না, একটু পরেছি, তাই আবার একজনের চোখ কটকট করছে।

আহা, অত ঝলমলে জিনিস চোখে একটু লাগবেই। ব্যাপারটা একটু খুলে বললেই তো হয়। কেসটা কী?

পরমা খোঁপার মাথাটা ঠিক করতে করতে বলল, ফ্ল্যাটবাড়ি হল একটা কমিউনিটি, জানেন তো!

জানব না কেন, বুদ্ধু নাকি? ছ'মাস আগেই কলকাতার এই ফ্ল্যাটবাড়ির নিয়ো কমিউনিটি নিয়ে ফিচার লিখেছিলাম।

জানি। পড়েওছি। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে চলতে হয়। আজ দোতলায় দোলাদের ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। ওদের মেয়ের জন্মদিন।

খুব খাওয়াল?

প্রচুর। মুরগি, গলদা, ভেটকি ফ্রাই, ফিশ রোল, লুচি, ফ্রায়েড রাইস, পায়েস...

রোখকে ভাই। তুমি ক্যালোরি হিসেব করে খাও না নাকি?

তার মানে?

ওরকম গান্ডেপিন্ডে খেলে যে দু'দিনেই হাতির মতো হয়ে যাবে।

আহা, আমার ফিগার নিয়ে ভেবে ভেবে তো চোখে ঘুম নেই। আমি অত বোকা নই মশাই, একখানা মুরগির ঠ্যাং দু'ঘণ্টা ধরে চিবিয়ে এসেছি মাত্র।

রোল খাওনি?

আধখানা।

গলদা ছেড়ে দিলে? চল্লিশ টাকা কিলো যাচ্ছে।

ওই একটু।

দইটা কেমন ছিল?

দই। না, দই করেনি তো। আইসক্রিম।

কেমন ছিল?

বাঃ, আইসক্রিম আবার কেমন হবে? ভালই।

মিষ্টির আইটেম করেনি তা হলে। ছ্যাঁচড়া আছে।

মোটেই না। তিনরকম সন্দেশ ছিল মশাই।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, না। তোমার ফিগার কিছুতেই রাখতে পারবে না পরমা। এত যে কেন খাও!

নজর দেবেন না বলছি।

দিচ্ছি না। কেউ আর দেবেও না।

খুব হয়েছে। দোলা আপনার জন্যও চর্বচোষ্য পাঠিয়েছে। এতক্ষণ ঘরে সেগুলো নিচু আঁচে রেখে বসে আছি। দয়া করে এবার গিলুন।

আমার জন্য! আমার জন্য পাঠাবে কেন? তারা কি আমাকে চেনে?

এমনিতে চেনে না। তবে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে মনে করে হঠাৎ চিনতে শুরু করেছে। যান তো, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।

ধৃতি হাত-মুখ ধুয়ে এল বটে, কিন্তু মুখে এক বিচ্ছিরি অরুচি জ্বরের পর থেকেই তার খাওয়ার আনন্দকে মাটি করে দিয়েছে। টেবিলে বসে বিপুল আয়োজনের দিকে চেয়ে সে শিউরে উঠে বলল, এক কাজ করো পরমা, মুরগি আর লুচি বাদে সব সরিয়ে নাও। ফ্রিজে রেখে দাও, পরে খাওয়া যাবে।

অরুচি হচ্ছে, না?

ভীষণ। খাবার দেখলেই এলার্জি হয় যেন।

কী করি বলুন তো আপনাকে নিয়ে!

আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা আছে ভবিষ্যতে। বুঝবে।

এখনই কি বুঝছি না নাকি?

বলে পরমা সযত্নে তাকে খাবার বেড়ে দিল। একটা বাটিতে খানিকটা চাটনি দিয়ে বলল, এটা মুখে দিয়ে দিয়ে খাবেন, রুচি হবে।

খেতে খেতে ধৃতি বলল, একটা মুশকিল হয়েছে পরমা।

কী মুশকিল?

টুপুর মা নেমন্তন্ন করেছে কাল।

কে টুপুর মা?

ওই যে সেদিন সুন্দর মেয়েটার ফোটো দেখলে, মনে নেই?

ওঃ, তা সে তো মরে গেছে।

বটেই তো, কিন্তু তার মা তো মরেনি!

নেমন্তন্নটা কীসের?

বোধহয় একটু আলাপ করতে চান।

আলাপও নেই?

নাঃ, শুধু ফোনে কথা হত।

কী বলতে চায় মহিলা?

তা কী করে বলব? হয়তো টুপুর কথা।

বেচারা।

যাব কি না ভাবছি।

যাবেন না কেন?

একটু ভয়-ভয় করছে। অচেনা বাড়ি, অচেনা ফ্যামিলি...

তাতে কী, আলাপ হলেই অচেনা কেটে গিয়ে চেনা হয়ে যাবে। আপনি অত ভিতু কেন?

আমি খুব ভিতু বুঝি?

ভিতু নন? আমার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন।

ধৃতি চোখদুটো একটু বুজে রেখে খুব নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোচটি কে বলো তো!

কোচ। কীসের কোচ?

তোমাকে এইসব আধুনিক কথাবার্তার ট্রেনিং দিচ্ছে কে?

কেন? আমার বুঝি কথা আসে না?

খুব আসে, হাড়ে-হাড়ে আসে, কিন্তু ভাই বন্ধুপত্নী, তুমি তো এত প্রগতিশীলা ছিলে না এতদিন!

হচ্ছি। আপনার পাল্লায় পড়ে। সে যাক গে, সব সময়ে অত ইয়ারকি ভাল নয়। ভদ্রমহিলা ডাকল কেন সেটা ভেবে দেখা ভাল।

আমি বলি কী পরমা, মেয়েছেলের কেস যখন তুমিও সঙ্গে চলো।

আমি! ওমা, আমাকে তো নেমন্তন্ন করেনি!

গুলি মারো নেমন্তন্ন।

তা হলে কী বলে গিয়ে দাঁড়াব? একটা কিছু পরিচয় তো চাই।

বউ বলেই চালিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি যে ব্যাচেলর তা ভদ্রমহিলা জানেন।

ইস্, ওঁর বউ সাজতে বয়ে গেছে।

একটা কাজ করা যাক পরমা, গিয়ে দু'জনে আগে হাজির হই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

পরমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ইচ্ছে করছে না এমন নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এত উদ্‌বেগের কোনও কারণ নেই। গিয়ে দেখেই আসুন না।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, তাই হবে। বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ।

পরমা কিছুক্ষণ ধৃতির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, রাত হয়েছে। রোগা শরীরে আর জেগে থাকতে হবে না। শুয়ে পড়ুন গে। শুয়ে শুয়ে ভাবুন।

ধৃতি উঠল।

৮

এত নিরস্ত্র এবং এত অসহায় ধৃতি এর আগে কদাচিৎ বোধ করেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও অকারণ দুর্বলতা বা ভয়-ভীতি নেই। কিন্তু এই এলাহাবাদি ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা রহস্যময়তার বোধ জমেছে ধৃতির। মহিলার কথাবার্তায় উলটোপালটা ব্যাপার আছে, মানসিক ভারসাম্যও হয়তো নেই। একটু যেন বেশি গায়ে-পড়া। তাছাড়া এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককল, চিঠিতে পোস্ট অফিসের ছাপ এবং টুপুর ছবি এর সব ক'টাই সন্দেহজনক। কাজেই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হতে আজ ধৃতির খুব কিন্তু-কিন্তু লাগছিল।

সকালে ধৃতি চা খেল তিন কাপ।

পরমা বলল, চায়ের কেজি কত তা মশাইয়ের জানা আছে?

কেন, চা-টা তো সেদিন আমিই কিনে আনলাম। লপচুর হাফ কেজি।

ও, আপনার পয়সায় কেনাটা বুঝি কেনা নয়?

মাইরি, তুমি জ্বালাতেও পারো।

আর শুধু চা কিনলেই তো হবে না। দুধ চিনি এসবও লাগে।

পরেরবার চিনি দুধ ছাড়াই দিয়ো।

আর দিচ্ছিই না। চিনি দুধ লিকার কোনওটাই পাচ্ছেন না আপনি।

আজ নার্ভ শক্ত রাখতে হবে পরমা। আজ এক রহস্যময়ীর সঙ্গে রহস্যময় সাক্ষাৎকার।

আহা, রহস্যের রস তো খুব। মাঝবয়সি আধপাগল এক মহিলা, তার আবার রহস্য কীসের? খুব যে রহস্যের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে।

স্বপ্ন নয় হে, স্বপ্ন হলে তো বাঁচতাম। কী কুক্ষণেই যে নেমন্তন্নটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম।

আবার ফোন করুন না, নেমন্তন্ন ক্যানসেল করে দিন। ভিতুর ডিমদের এইসব কাজ করতে যাওয়াই ঠিক নয়। এখন দয়া করে আসুন, রোগা শরীরে খালিপেটে চা না গিলে একটু খাবার খেয়ে উদ্ধার করুন।

তোমার ব্রেকফাস্টের মেনু কী?

লুচি আর আলুভাজা।

কুকিং মিডিয়াম কি বনস্পতি নাকি?

কেন? গাওয়া ঘি চাই নাকি? গরিবের বাড়ি এটা, মনে থাকে না কেন? এখনও ফ্ল্যাটের দাম শোধ হয়নি।

ধৃতি ওঠার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ছেলেবেলায় কখনও এই অখাদ্যটা কারও বাড়িতে তেমন ঢুকতে দেখিনি। বনস্পতি হল পোস্ট-পার্টিশন বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সিনেমা। কে ওটা আবিষ্কার করেছে জানো?

না। গরিবের কোনও বন্ধু হবে।

তার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

আর বনস্পতির নিন্দে করতে হবে না। আমাদের পেটে সব সয়।

ছাই সয়। সাক্ষাৎ বিষ।

আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। রুগি মানুষকে বনস্পতি খাওয়াব আমি তেমন আহাম্মক নই। ময়দায় ঘিয়ের ময়েন দিয়ে বাদাম তেলে ভাজা হচ্ছে। ভয় নেই, আসুন।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, এর চেয়ে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট ভাল ছিল পরমা। টোস্ট, ডিম, কফি।

কাল থেকে তাই হবে। খাটুনিও কম।

ধৃতি উঠল, খেল। তারপর দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে স্নান করে প্রস্তুত হতে লাগল।

পরমা হঠাৎ উড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, কী ড্রেস পরে যাচ্ছেন দেখি! এ মা! ওই সাদা শার্ট আর ভুসকো প্যান্ট! আপনার রুচি-টুচি সব যাচ্ছে কোথায় বলুন তো!

কেন, এই তো বেশ। তা হলে কী পরব?

সেই নেভি ব্লু প্যান্টটা কোথায়?

আছে।

আর মাল্টি কালার স্ট্রাইপ শার্ট?

আছে বোধহয়।

ওই দুটো পরে যান।

অগত্যা ধৃতি তাই পরল। পরমা দেখে-টেখে বলল, মন্দ দেখাচ্ছে না। রুগ্ন ভাবটা আর চোখে পড়বে না বোধহয়।

ধৃতির পোশাকের দিকে মন ছিল না। মনে উদ্‌বেগ, অস্বস্তি। রওনা হওয়ার সময় পরমা দরজার কাছে এসে বলল, অফিসে গিয়ে একবার ফোন করবেন। লালিদের ফ্ল্যাটে আমি ফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

কেন পরমা, ফোন করব কেন?

একটু অ্যাংজাইটি হচ্ছে।

এই যে এতক্ষণ আমাকে সাহস দিচ্ছিলে!

ভয়ের কিছু নেই জানি, কিন্তু আপনার ভয় দেখে ভয় হচ্ছে। করবেন তো ফোন? তিনটে পনেরো মিনিটে।

আচ্ছা। তা হলে আমার জন্য তুমি ভাবো?

যা নাবালক! ভাবতে হয়।

ধৃতি একটু হালকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টুপুর মায়ের ঠিকানা খুব জটিল নয়। বড়লোকদের পাড়ায় বাস। সুতরাং খুঁজতে অসুবিধে হল না।

ট্যাকসি থেকে নেমে ধৃতি কিছুক্ষণ হাঁ করে বাড়িটা দেখল। বিশাল এবং পুরনো বাড়ি। জরার চিহ্ন থাকলেও জীর্ণ নয় মোটেই। সামনেই বিশাল ফটক। ফটকের ওপাশ থেকেই অন্তত দশ গজ চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু প্রকাণ্ড বারান্দায়। বারান্দায় মস্ত গোলাকার থামের বাহার। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু এখনকার পাঁচতলাকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে বসে আছে।

ফটকে প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক দারোয়ান মোতায়েন দেখে ধৃতি আরও ঘাবড়ে গেল।

দারোয়ান ধৃতিকে ট্যাকসি থেকে নামতে দেখেছে। উপরন্তু ওর পোশাক-আশাক এবং চেহারাটা বোধহয় দারোয়ানের খুব খারাপ লাগল না। ধৃতি সামনে যেতেই টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম গোছের ভঙ্গি করে ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে চাইছেন?

টুপুর মা। মানে—

দারোয়ান গেটটা হড়াস করে খুলে দিয়ে বলল, যান।

ধৃতি অবাক হল। যাবে, কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়িটা দেখে তো মনে হচ্ছে সাতমহলা। এর কোন মহল্লায় কে থাকে তা কে জানে?

ধৃতি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার কেমন যেন এই দুপুরেও গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে খুব তীক্ষ্ণ নজরে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে ধৃতি দেখল, একখানা হলঘরের মতো প্রকাণ্ড জায়গা। সবটাই মার্বেলের মেঝে। বারান্দার তিনদিকেই প্রকাণ্ড তিনটে কাঠের ভারী পাল্লার দরজা। দু'পাশের দরজা বন্ধ, শুধু সামনেরটা খোলা।

ধৃতি পায়ে পায়ে এগোল।

দরজার মুখে দ্বিধান্বিত ধৃতি দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম পুরনো জমিদারি কায়দার বাড়ি ধৃতি দূর থেকে দেখেছে অনেক, তবে কখনও ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি। এইসব বাড়িতেই কি একদা ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বাইজি নাচত আর উঠত ঝনাঝন মোহরের প্যালা ফেলার শব্দ? এইসব বাড়িরই অন্দরমহলে কি গভীর রাত অবধি স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে থেকে অবিরল অশ্রুমোচন করত অন্তঃপুরিকারা? চাষির গ্রাস কেড়ে নিয়েই কি একদা গড়ে ওঠেনি এইসব ইমারত? এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ঢুকে আছে পাপ আর অভিশাপ?

বাইরের ঘরটা বিশাল। এতই বিশাল যে তাতে একটা বাস্কেটবলের কোর্ট বসানো যায়। সিলিং প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে। কিন্তু আসবাব তেমন কিছু নেই। কয়েকটা পুরনো প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। ঘরের মাঝখানে একটা নিচু তক্তপোশে সাদা চাদর পাতা, কয়েকটা কাঠের চেয়ার, মেঝেয় ফাটল, দাগ। দেয়ালে অনেক জায়গায় মেরামতির তাপ্পি। তবু বোঝা যায়, এ বাড়ির সুদিন অতীত হলেও একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়নি।

ধৃতি কড়া নাড়ল না বা কাউকে ডাকার চেষ্টা করল না। কারণ ধারে-কাছে কেউ নেই। ঘরটা ফাঁকা। ছাদের কাছ বরাবর কড়ি-বরগায় পায়রারা বকবক করছে। কিন্তু ধৃতির মনে হচ্ছিল, ঘর ফাঁকা হলেও কেউ কোনও এক রন্ধ্র-পথে বা ঘুলঘুলি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকে ঠিকই লক্ষ করছে। এমন মনে করার কারণ নেই, অনুভূতি বলে একটা জিনিস তো আছেই।

ধৃতি সাহসী নয়, আবার খুব ভিতুও নয়। মাঝামাঝি। তার বুক একটু দুরুদুরু করছিল ঠিকই, তবে সেটা অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশ বলে। কয়েক বছর আগে এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে গিয়ে সে একটা ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেই বাড়ির এক সন্দিগ্ধ ও খিটকেলে বুড়ো তাকে বাইরের ঘরে ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রেখে বিস্তর জেরা করে এবং নানাবিধ প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়। ধৃতি সেই থেকে অচেনা বাড়িতে ঢুকতে একটু অস্বস্তি বোধ করে আসছে।

প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। যাতায়াতকারী কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু ধৃতি একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ক্ষীণ হলেও নির্ভুল শব্দ। কাছেপিঠে কোথাও, হলঘরের আশেপাশের কোনও ঘরে কারা যেন টেবিল টেনিস খেলছে।

বুকপকেটের আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে একবার দেখে নেয় ধৃতি। সে এক মস্ত খবরের কাগজের সাব-এডিটর। এই পরিচয়-পত্রখানা যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশে কাজে লাগে। রেলের রিজার্ভেশনে, থানায়, বাইরের রিপোর্টিং-এ। এ বাড়িতে কেউ তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তুললে কাজে লাগাতে পারে।

ধৃতি ভিতরে ঢুকল এবং শব্দটির অনুসরণ করে বাঁদিকে এগোল। হলঘরের পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বাটে। সবুজ বোর্ডের দু'পাশে একটি কিশোর ও একটি কিশোরী অখণ্ড মনোযোগে টেবিল-টেনিস খেলছে। মেয়েটির পরনে লাল শার্ট এবং জিনসের শর্টস। ছেলেটির পরনেও জিনসের শর্টস, গায়ে হলুদ টি-শার্ট। দু'জনেরই নীল কেডস্। মেয়েটির চুল স্টেপিং করে কাটা। ছেলেটির চুল লম্বা। দু'জনের বয়সই পনেরো-ষোলোর মধ্যে।

ধৃতি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে প্রথম লক্ষ করল মেয়েটিই। একটা মারের পর বল কুড়িয়ে সোজা হয়েই থমকে গেল। তারপর রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল, হুম ডু-ইয়া ওয়ান্ট?

কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে শেখা হেঁচকি তোলা ইংরিজি নয়। রীতিমতো মার্কিন অ্যাকসেন্ট।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

মেয়েটা ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, আছে বোধহয়। দোতলায়। পিছন দিকে সিঁড়ি আছে। গিয়ে দেখুন।

ধৃতি তবু দ্বিধার সঙ্গে বলল, ভিতরে কি খবর না দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?

মেয়েটি সার্ভ করার জন্য হাতের স্থির তোলায় বলটা রেখে বাঘিনীর মতো খাপ পেতে শরীরটাকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছেড়ে দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল। সেই অবস্থাতেই ধৃতির দিকে একঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, উড শি মাইন্ড? নো প্রবলেম। শি ইজ আ বিট গা-গা। গো অ্যাহেড। আপস্টেয়ার্স, ফাস্ট রাইট হ্যান্ড রুম। নোবডি উইল মাইন্ড। নান মাইন্ডস হিয়ার। নান হ্যাজ এনিথিং লাইক মাইন্ড।

ধৃতি একসঙ্গে মেয়েটির মুখে এত কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এত কথার মানেই হয় না। তার মনে হল, এরা দুটি ভাইবোন কোনও সমৃদ্ধ দেশে, হয়তো আমেরিকায় থাকে। এ দেশে এসেছে ছুটি কাটাতে এবং সময়টা খুব ভাল কাটাচ্ছে না। নিজেদের বাড়ি কি এটা ওদের? হলে বলতে হবে, নিজেদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে ওরা মোটেই খুশি নয়। সেই বিরক্তিটাই তার কাছে প্রকাশ করল।

বেশ খোলা হাতে টপ স্পিন সার্ভ করল মেয়েটি। ছেলেটি পেন হোল্ড গ্রিপ-এ খেলছে। পিছনে দু'পা সরে গিয়ে সপাটে স্ম্যাশ করল। মেয়েটি টেবিল থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে স্ম্যাশটা তুলে দিল টেবিলে...

ধৃতির হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল এদের এলেম দেখে। তবে সে র‍্যালিটা দাঁড়িয়ে দেখল। মেয়েটাই তুখোড়। বারবার ছেলেটার ব্যাক হ্যান্ডে ফেলছে বল। পেন হোল্ড গ্রিপ-এ ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না বলে ছেলেটিকে হাত ঘুরিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হচ্ছিল। মেয়েটা পয়েন্ট নিয়ে নিল।

ধৃতি এটুকু দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে সিঁড়ি আছে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে যেতে হবে তা মেয়েটা বলে দেয়নি। ধৃতি হলঘরটা পার হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি মারতেই পুরনো চওড়া পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দেখতে পায়। বাড়িটা খুবই নির্জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু সাহস সঞ্চয় করতেই হবে। নইলে এতটা এসে ফিরে গেলে সে নিজের কাছেই নিজে কাপুরুষ থেকে যাবে চিরকাল।

সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল ধৃতি। এবং ওপরে উঠে মুখোমুখি হঠাৎ একজন দাসী গোছের মহিলাকে দেখতে পেল সে। হাতে একটা জলের বালতি।

ধৃতি খুব নরম গলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

ঝি খুব যেন অবাক হয়েছে এমন মুখ করে বলল, কার মা?

টুপুর মা। আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ঝি-টার অবাক ভাব গেল না। বলল, আসতে বলেছিলেন? ওমা! সে কী গো?

এই উক্তির পর কী বলা যায় তা ধৃতির মাথায় এল না। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

ঝি-টা একটু হেসে বলল, আসতে বলবে কী? সে তো পাগল।

গা-গা বলতে নীচের মেয়েটা তা হলে বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু পাগল কেন হবে টুপুর মা? একটু ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু খুব পাগল কি?

কোন ঘরটা বলুন তো?— ধৃতি জিজ্ঞেস করে।

ওই তো দরজা। ঠেলে ঢুকে যান।

ধৃতির হাত-পা ঠান্ডা আর অবশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ নয় তো? কিন্তু সামান্য একটু রোখও আছে ধৃতির। যে কোনও ঘটনারই শেষ দেখতে ভালবাসে।

দ্বিধা ঝেড়ে সে ডান দিকের দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড ঘর। খুব উঁচু সিলিং। মেঝে থেকে জানালা। ঘরের মধ্যে এক বিশাল পালঙ্ক, কয়েকটা পুরনো আমলের আসবাব, অর্গান, ডেস্ক, চেয়ার, বুকশেলফ্, আলনা, থ্রি পিস আয়নার ড্রেসিং টেবিল, আরও কত কী।

খাটের বিছানায় এক প্রৌঢ়া রোগা-ভোগা চেহারার মহিলা শুয়ে আছেন। চোখ বোজা। গলা পর্যন্ত টানা লেপ। বালিশে কাঁচা-পাকা চুলের ঢল। একসময়ে সুন্দরী ছিলেন, এখনও বোঝা যায়।

ধৃতি শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করল যাতে উনি চোখ মেলেন।

মেললেন এবং ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, কে?

আমি ধৃতি। ধৃতি রায়।

ধৃতি রায়! কে বলো তো তুমি?

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

না তো! হ্যারিকেনটা উসকে দাও তো। তোমাকে দেখি।

এখন তো দিনের আলো।

কোথায় আলো? আলো আবার কবে ছিল? তোমার সাঁইথিয়ায় বাড়ি ছিল না?

না।

টুপুর মা উঠে বসেছেন। চোখে খর অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কার খোঁজে এসেছেন?

আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন ফোনে। মনে নেই?

ও তাই বলো। তা বোসো বোসো। আমি খুব ফোনের শব্দ পাই, বুঝলে! কেন পাই বলো তো! এত ফোন কে কাকে করে জানো?

না।

টুপুর মা'র পরনে থান, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে প্রাচীন সব আঁকিবুকি। টুপুর মা'র যে গলা ধৃতি টেলিফোনে শুনেছে এঁর গলা মোটেই তেমন নয়।

তুমি কে বললে?

ধৃতি রায়। আমি খবরের কাগজে লিখি।

খবরের কাগজ! এখন পুরনো খবরের কাগজ কত করে কিলো যাচ্ছে বলো তো! আমাকে সেদিন একটা কাগজওয়ালা খুব ঠকিয়ে গেছে।

জানি না।

তোমার দাঁড়িপাল্লা কোথায়? বস্তা কোথায়?

আমি কাগজওয়ালা নই।

শিশি-বোতল নেবে? অনেক আছে।

ধৃতি ফাঁপড়ে পড়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সন্দেহের লেশ নেই, সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভুলে পা দিয়েছে। তবু মরিয়া হয়ে সে বলল, আপনি আমাকে ফোন করে টুপুর খবর দিয়েছিলেন, মনে নেই? এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল।

টুপুর মা অন্যদিকে চেয়ে বললেন, সে কথাই তো বলছি তোমাকে বাগদি বউ, অত ঘ্যানাতে নেই। পুরুষমানুষ কি ঘ্যানানি ভালবাসে?

ধৃতি একটু একটু ঘামছে।

আচমকাই সে আয়নায় দেখল, দরজাটা সাবধানে ফাঁক করে ঝি-টা উঁকি দিল।

শুনছেন?

ধৃতি ফিরে চেয়ে বলল, কী?

উনি কি আপনার কেউ হন?

না। চেনাও নয়। ফোন পেয়ে এসেছি।

আপনি একটু বাইরে আসুন। মেজ গিন্নিমা ডাকছেন।

ধৃতি হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ল। টুপুর মা তাকে আর আমল না দিয়ে ফের গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়ল।

সাবধানে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঝি বলল, ওই ঘর, চলে যান।

মেজ গিন্নিমা কে?

উনিই কর্ত্রী। যান না।

ধৃতি এগোল। এ ঘরের দরজা খোলা এবং সে ঘরে ঢোকার আগেই পর্দা সরিয়ে একজন অত্যন্ত ফরসা ও মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আসুন ভাই, ভিতরে আসুন।

ঘরটা বেশ আধুনিক কায়দায় সাজানো। যদিও প্রকাণ্ড, সোফা সেট আছে, দেয়ালে যামিনী রায় আছে।

তাকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো! টুপুর মা নাকি আপনাকে ডেকে এনেছে? কী কাণ্ড।

ধৃতি থমথমে মুখ করে বলল, কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে আপনি শুনতে চাইলে ব্যাপারটা ডিটেলসে বলতে পারি।

বলুন না। আগে একটু চা খেয়ে নিন, কেমন?

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। একটু বাদে চা এল, একটু সন্দেশের জলখাবারও।

ধৃতি শুধু চা নিল, তারপর মিনিট পনেরো ধরে আদ্যোপান্ত বলে গেল ঘটনাটা।

ভদ্রমহিলা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। কোনও উঃ, আঃ, আহা, তাই নাকি, ওমা এসব বললেন না। সব শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার আশ্চর্য লাগছে কী জানেন?

কী বলুন তো?

টুপুর ঘটনাটা মোটেই মিথ্যে নয়। এরকমই ঘটেছিল। তবে তা ঘটেছিল বছর সাতেক আগে। সেই থেকে টুপুর মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। এখন আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি। যতদিন বাঁচবেন ওরকমই থাকবেন। তবে গল্পটার শেষটাই রহস্য। আপনাকে যে ফোন করত সে আর যেই হোক টুপুর মা নয়।

তা হলে কে?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, উনি ঘর থেকেই বেরোন না। ফোন করতে জানেনও না বোধহয়। তবে যেই করুক সে আমাদের অনেক খবর রাখে।

টুপু কি সত্যিই মারা গেছে?

মাথা নেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলা অসম্ভব। পুলিশও কোনও হদিশ পায়নি। কোথায় যে গেল মেয়েটা।

কিছু মাইন্ড করবেন না, উনি মানে টুপুর মা আপনার কে হন?

আমার বড় জা। ওঁরা তিন ভাই। বড় জন নেই, ছোট অর্থাৎ আমার দেওর আমেরিকায় থাকে। ওখানকারই সিটিজেন। ছুটি কাটাতে এসেছে। দু'ভাই মিলে আজ মাছ ধরতে গেছে ব্যান্ডেলে।

নীচের তলায় যে দুটি ছেলেমেয়েকে টেবিল টেনিস খেলতে দেখলাম ওরা কারা? আপনার দেওরের ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ।— বলে মেজগিন্নি একটু তেড়চা হেসে বললেন, একেবারে সাহেব-মেম। এ দেশের কিছুই পছন্দ নয়। কেবল নাক সিঁটকে থাকে সবসময়।

আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

মেয়ে শান্তিনিকেতনে। ছেলে দু'টি। দু'জনেই বাঙ্গালোরে ডাক্তারি পড়ে।

বাঙ্গালোরে কেন?

আমরা ওখানেই থাকতাম। আমার হাজব্যান্ডের তখন ওখানে একটা পার্টনারশিপের ব্যাবসা

ছিল। উনি একটু খেয়ালি। হঠাৎ 'ভাল লাগছে না' বলে নিজের শেয়ার বেচে চলে এলেন। ছেলেরা হস্টেলে থাকে।

আর কেউ নেই এ বাড়িতে?

মেজগিন্নি খুব অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, টুপুর মা সেজে ফোন করার মতো কেউ তো এ বাড়িতে আছে বলে মনে হয় না!

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, না, ঠিক তা বলিনি। আমি ব্যাপারটায় নিজেকে জড়াতেও চাইছিলাম না। বুঝতে পারছি না ঘটনার মানে কী?

হয়তো কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো আপনার পরিচিতা কেউ। তবে আশ্চর্যের কথা হল, টুপু সম্পর্কে সে কিছু জানে। যাক গে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখে গেলেন, এখন ঘটনাটা ভুলে যেতে চেষ্টা করুন।

মেজগিন্নিকে ধৃতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোলগাল ফরসা, জমিদারগিন্নি ধরনের চেহারা। বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। চোখে মুখে বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি খুব হতাশা বোধ করে উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা, আজ চলি।

আসুন ভাই। আপনার খবরের কাগজের লেখা আমিও কিন্তু পড়েছি। আপনি তো ফেমাস লোক।

ধৃতি ক্লিষ্ট একটু হাসল।

ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তার রিপোর্টটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আবার কখনও ইচ্ছে হলে আসবেন।

আচ্ছা।

ধৃতি একা ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ক্লান্ত লাগছে। হতাশ লাগছে। সে একটা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সেটা যে কী তা স্পষ্ট নয়। তার বদলে যা দেখল তা বিকট।

ধৃতি যখন মাঝ-সিঁড়িতে তখন তলা থেকে দুদ্দাড় করে সেই কিশোরী মেয়েটি উঠে আসছিল, পথ দিতে একটু সরে দাঁড়াল ধৃতি। মেয়েটা উঠতে উঠতে তাকে দেখে থমকে গেল। মুখে জবজব করছে ঘাম। একটু লালচে মুখ।

ডিড ইয়া মিট হার?

হ্যাঁ।

মেয়েটা হঠাৎ একটু হাসল। সুন্দর মুখশ্রী যেন আরও ফুটফুটে হয়ে উঠল।

পাগলি নয়?

ধৃতিও একটু হাসল। বলল, তাই তো মনে হল।

আপনি কি কোনও রিলেটিভ?

না! পরিচিত।

টেক হার সামহোয়ার। নার্সিংহোম বা মেন্টাল হোম কোথাও নিয়ে গেলেই তো হয়। জেঠু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, তাই দেওয়া উচিত। আচ্ছা, এ বাড়ির ফোনটা কোন ঘরে?

জেঠুর ঘরে। ফোন করবেন? আসুন না আমার সঙ্গে।

না। তার দরকার নেই। ভাবছিলাম ফোন করলে টুপুর মাকে পাওয়া যাবে কি না। আচ্ছা নম্বরটা কত?

মেয়েটা নম্বর বলল। ধৃতি মনে মনে দু'-একবার আউড়ে মুখস্থ করে নিল।

মেয়েটা বলল, বাই।

তারপর উঠে গেল দ্রুত পায়ে।

বাই।-- বলে ধৃতি নেমে এল নীচে। মনটা বিস্বাদে ভরে গেছে। হতাশা এবং গ্লানি বোধ করছে সে। কেন যে, কে জানে! এতটা আশাহত হওয়ার মতো কিছু নয়। ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই হয়। পারছে না। তার মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জোক নয়, ভিতরে আর একটা কিছু আছে। সেটা সে ধরতে পারল না।

মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হয়েই ধৃতি যখন বেরোতে যাচ্ছিল তখন দেখল, হলঘরে সেই ঝি-টা মেঝে মুছছে উবু হয়ে বসে। তাকে দেখে কৌতূহলভরে একটু চেয়ে রইল।

ধৃতি তাকে উপেক্ষা করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, একজন যে বসে আছে আপনার জন্য।

ধৃতি চমকে উঠে বলল, কে?

ঝি ফিক করে হেসে বলল, বাঃ বুড়োকর্তা আছে না?

সে আবার কে?

সে-ই তো সব। দেখা করবেন না?

বুড়ো মানুষ, খিটখিটে নন তো?

না গো, তবে খুব বকবক করেন। নতুন মানুষ পেলে তো কথাই নেই। ওইদিকে ঘর। চলে যান।

হলঘরের ডানপ্রান্তে একটা ভেজানো কপাট দেখা যাচ্ছিল। মরিয়া ধৃতি পায়ে পায়ে গিয়ে দরজায় শব্দ করল।

এসো, চলে এসো। এভরিবডি অলওয়েজ ওয়েলকম।

ধৃতি দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। লম্বাটে এবং বেশ বড়সড় ঘরখানা। দক্ষিণের জানালা দরজা খোলা বলে ধপ ধপ করছে আলো। একখানা মজবুত ও ভারী চৌকির ওপর সাদা বিছানা পাতা। দরজার পাশেই একখানা ডেক চেয়ার। তাতে সাদা দাড়িওয়ালা এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারার মানুষ বসে আছেন। পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে একটা সুতির গেঞ্জির ওপর একটা উলের গেঞ্জি। শরীরের কাঠামোটা প্রকাণ্ড। বোঝা যায় একসময়ে খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এখনও শরীরে মেদের সঞ্চার নেই। বয়স আশি বা তার ওপর। কিন্তু চোখে গোল রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমার ভিতরে দুটি চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ এবং কৌতুকে ভরা।

মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার পাতা। সেটা দেখিয়ে বললেন, বোসো। এ বাড়িতে নতুন কেউ এলেই আমি তাকে ডেকে পাঠাই। কিছু মনে করোনি তো?

ধৃতি বসল এবং মাথা নেড়ে বলল, না।

কার কাছে এসেছিলে?

ধৃতি হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমি একটা ভুল খবর পেয়ে এসেছিলাম। যার কাছে এসেছিলাম আসলে তার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই।

একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন! কার কাছে এসেছিলে বলো তো?

টুপুর মা। ওই নাম নিয়ে কে যেন আমাকে অফিসে প্রায়ই টেলিফোন করত। কালও টেলিফোনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই জন্যই আসা।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে গেলেন। সামনের শূন্যে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ স্বপ্নাতুর ও ভাসা-ভাসা হয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমাকে কি সে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল?

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সেইরকমই। তবে সেটা বড় কথা নয়।

বুড়োকর্তা তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই দুপুরের খাওয়া খেয়ে আসোনি?

আপনি খাওয়ার ব্যাপারটা বড় করে দেখছেন কেন? ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

বুড়োকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে একটু বুঝতে দাও। বুড়ো হলে মগজে ধোঁয়া জমে যায়

বটে, তবু অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। তোমার নাম কী? কী করো?

ধৃতি বলল।

বুড়োকর্তা মাথা ওপর নীচে দুলিয়ে বললেন, জানি। তোমার লেখা আমি পড়েছি। খবরের কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়া আমার রোজকার কাজ।

ধৃতি বিনয়ে একটু মাথা নোয়াল। তারপর বলল, আপনি অযথা এই ঘটনাটা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হবেন না। কেউ একটু আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেয়েছিল।

রসিকতা!— বলে বুড়োকর্তা একটু অবাক হলেন যেন। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, এমনও হতে পারে যে সে কোনও একটি সত্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। নইলে একটি মেয়ে তোমাকে বারবার ফোন করবে কেন?

সেটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

তাছাড়া সে সবটাই কিন্তু মিথ্যে বলেনি। আমার নাতনি টুপুর সত্যিই কোনও ট্রেস নেই কয়েক বছর। আমরা ধরে নিয়েছি যে সে মারা গেছে। সম্ভবত খুন হয়েছে। এগুলো তো মিথ্যে নয়।

সম্ভবত সে ঘটনাটা জানে।

তা তো জানেই। কিন্তু কে হতে পারে সেটাই ভাবছি।

হয়তো আপনাদের চেনা কেউ।

তোমার কি আজ কোনও জরুরি কাজ আছে?

কেন বলুন তো?

যদি সংকোচ বোধ না করো তবে আমার সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও। যে-ই তোমাকে নিমন্ত্রণ করুক সে এ বাড়িকে জড়িয়েই তো করেছে। নিমন্ত্রণটা অন্তত সত্যিকারের হোক। আমার রান্না আলাদা হয়, আলাদা ব্রাহ্মণ পাচক রাঁধে, আমি ওদের সঙ্গে খাই না। এ ঘরেই সব ব্যবস্থা হবে।

আমার একদম খিদে নেই।

তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ এবং এ বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইছ বলে খিদে টের পাচ্ছ না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার মনে হয়, তোমাকে যে এতদূর টেনে এনেছে তার কোনও পজিটিভ উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আমি তোমাকে কিছু সাহায্যও করতে পারব, যদি অবশ্য টুপুর রহস্য ভেদ করতে আগ্রহ বোধ করো।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমার আগ্রহ নেই। টুপুর কেসটা মনে হয় ক্লোজড চ্যাপ্টার। আর পুলিশই যখন কিছু পারেনি তখন আমার কিছু করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি ডিটেকটিভ নই।

বুড়োকর্তা খুব সমঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, ঠিক কথা। অর্বাচীনের মতো দুম করে অন্য কারও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ভাল নয়। তবে এই বুড়ো মানুষটার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে দুপুরবেলা তোমার সঙ্গে বসে দু'টি খেতে, তা হলে তোমার আপত্তি হবে কেন?

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, একটিমাত্র কারণে। যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সে একটা ফ্রড। আমি সেই নিমন্ত্রণ মানতে পারি না।

ফ্রড!— বুড়োকর্তা আবার অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ঘটনাটা আমাকে আর একটু ডিটেলসে বলতে পারো? যদি বিব্রত বোধ না করো?

ধৃতি আবার একটু দম নিল। তারপর সেই নাইট ডিউটির রাত থেকে শুরু করে সব ঘটনাই বলে গেল। বুড়োকর্তা চুপ করে শুনলেন। সবটা শুনে তারপর মুখ খুললেন।

ফোটোটা তোমার কাছে আছে?

আছে।

দেখাতে পারো?

ধৃতির ব্যাগে ফোটোটা প্রায় সবসময়েই থাকে। সে বের করে বুড়োকর্তার হাতে দিল।

উনি একপলক তাকিয়েই বললেন, টুপুই। কোনও সন্দেহ নেই।

ফোটোটা ফেরত নিয়ে ধৃতি বলে, এই ফোটো কার হাতে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বুড়োকর্তা হাত উলটে অসহায় ভাব করে বললেন, কে বলতে পারে তা? চিঠিটা দেখাতো পারো?

পারি।— বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দিল।

বুড়োকর্তা চিঠিটা দেখলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর পড়লেন। ফের মাথা নেড়ে বললেন, হাতের লেখা কার কেমন তা আমি জানি না। সুতরাং এ বাড়ির কেউ লিখে থাকলেও আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

ধৃতি মৃদু হেসে বলল, চিনেই বা লাভ কী? ব্যাপারটা সিরিয়াসলি না ধরলেই হয়।

তা বটে। তবে তুমি যত সহজে উড়িয়ে দিতে পারছ আমার পক্ষে তা অত সহজ নয়। ঘটনাটা তো এই বংশেরই। টুপুর সমস্যার কোনও সমাধানও তো হয়নি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই চিঠি আর ফোটো আপনিই রেখে দিন বরং।

লাভ কী? আমি বুড়ো, অক্ষম। আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব? বরং তোমার কাছেই থাক। তুমি হয়তো বা কোনওদিন কোনও সূত্র পেয়ে যেতে পারো।

বলছেন যখন থাক। কিন্তু আমার মনে হয় এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

এবার খেতে দিতে বলি?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। আমি খাব না। প্লিজ, আমাকে আপনি জোর করবেন না।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম রয়ে রইলেন ফের। তারপর দাড়ি গোঁফের ফাঁকে চমৎকার একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ, যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বুড়োর কাছে এসো। তোমাকে আমার বেশ লাগল।

৯

অফিসে এসে ধৃতি আজ বহুক্ষণ আনমনা রইল। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়াল। তারপর ফের এসে বসে রইল টেলিফোনটার কাছে।

উমেশবাবু টেলিপ্রিন্টারের কপি কাটতে কাটতে তলচোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, আজ যেন একটু বিরহী-বিরহী দেখাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী?

বিরহই। বউ বাপের বাড়ি গেছে।

হুঁ। বাপের বাড়ি থেকে টোপর পরে গিয়ে নিজে টেনে আনো গে না! বিয়ে করতে মুরোদ লাগে বুঝলে! এত টাকা মাইনে পাও তবু বিয়ে করার সাহস হয় না কেন? পণপ্রথার ওপর খুব তো গরম গরম ফিচার ছাড়ছ, নিজে একটা অবলা জীবকে উদ্ধার করে দেখাও না! আমি যখন বিয়ে করি তখন চাকরি ছিল না, বাপের হোটেলে খেতাম। প্রথম চাকরি হল আটাশ টাকা মাইনেয়, বুঝলে...

কথার মাঝখানেই ফোন বাজল।

উমেশবাবু 'হ্যালো' বলেই ফোনটা ধৃতির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, নাও, বাপের বাড়ি থেকেই বোধহয় করছে ফোন।

ধৃতি একটু কেঁপে উঠল। বুকটা দুরুদুরু করল। ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, হ্যালো।

ওপাশে সেই কণ্ঠস্বর। একটু কোমল। একটু বিষণ্ণতর।

আপনি না খেয়েই চলে গেলেন।

আপনার লজ্জা করে না?

শুনুন, প্লিজ। রাগ করবেন না।

রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

জানি। আমার চেয়ে বেশি সে কথা আর কে জানে? তবু পায়ে পড়ি। রাগ করবেন না।

তা হলে আপনার পরিচয় দিন।

সেটা এখনই সম্ভব নয়। তবে আমি টুপুর মা নই।

তবে কি আপনি টুপু?

উঃ, কী যে সব বলছেন না! আপনার টেবিলের লোক নিশ্চয়ই শুনছে আর হাঁ করে চেয়ে আছে!

উমেশবাবু ঠিক হাঁ করে চেয়ে ছিলেন না। তবে স্বভাবসিদ্ধ তলচোখের চাউনিটা ধৃতির দিকেই নিবদ্ধ রেখেছেন। ধৃতি গলা আরও নামিয়ে বলল, পরিচয় না দিলে আর কোনও কথা নেই।

আপনি সবই জানতে পারবেন। শুধু একটু যদি সময় দেন।

ধৃতি দৃঢ় গলায় বলে, আর নয়। সময় এবং প্রশ্রয় আমি অনেক দিয়েছি আপনাকে। আজ রীতিমতো অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আপনি এতটা কেন করলেন? আমি তো কোনও ক্ষতি করিনি আপনার!

না। আপনার মতো ভদ্রলোক হয় না। আমি কাণ্ডটা করেছি শুধু টুপুর মায়ের অবস্থাটা আপনি নিজের চোখে দেখবেন বলে।

তাতে কী লাভ? আমি তো কিছু করতে পারব না।

আপনি কি জানেন যে টুপুর মায়ের অনেক সম্পত্তি?

না। আপনার মুখে শুনেছি মাত্র।

বিশ্বাস করুন, সম্পত্তি জিনিসটা খুবই খারাপ। টুপু ছিল সেই সম্পত্তির ওয়ারিশান।

তা হবে। শুনে আমার লাভ কী?

আপনার লাভ না হলেই কি কিছু নয়? ধৈর্য ধরে একটু শুনবেন তো!

শুনছি।

টুপুর মৃত্যুসংবাদ আমি রটাতে চেয়েছিলাম টুপুর জন্যেই। আমার বিশ্বাস টুপু বেঁচে আছে। কিন্তু ওর আত্মীয়রা ওকে বেঁচে থাকতে দিতে চায় না। মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে ও নিরাপদ। কেউ আর ওকে মারতে চাইবে না।

কেন? টুপুর মৃত্যুতে তাদের কী লাভ?

টুপু বেঁচে থাকলে ওদের চলবে কী করে? অত বড় বাড়ি দেখলেন, কিন্তু ফোঁপড়া। কিছু নেই ওদের। পুরো সংসার চলছে টুপুদের টাকায়।

এত কথা আমাকে বলছেন কেন?

তা জানি না। বোধহয় কাউকে জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি।

তা হলে আইনের আশ্রয় নিন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পুলিশেও যেতে পারেন।

আমি কে যে সেসব করতে যাব?

তবে আমিই বা কে?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, তা অবিশ্যি সত্যি। আপনাকে আজ হয়রান করা আমার হয়তো উচিত হয়নি, আপনি রেগে আছেন।

তা আছি।

আপনার অফিসে টেলিফোনের ডাইরেক্ট লাইন নেই? থাকলে দিন না। পি বি এক্স লাইনে তো কোনও কথাই গোপন থাকে না।

আর কী বলার আছে আপনার?

প্লিজ, দিন। আর টেলিফোনের কাছে থাকুন দয়া করে। আমি এক্ষুনি রিং করব।

ধৃতি রিপোর্টিং-এর একটা নম্বর দিল এবং ফোনটা রেখে রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে গজরাতে টেলিফোনটার কাছে গিয়ে বসল। এখন রিপোর্টিং ফাঁকা। প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে।

ফোনটা বাজতেই লাইন ধরল ধৃতি, হ্যাঁ বলুন।

আপনিই তো?

তবে আর কে হবে?

একটু হাসি শোনা গেল, না মানে ভীষণ ভয় করে। কী করছি কে জানে!

মজা করছেন। আর কী?

মোটেই না। রেগে আছেন বলে আপনি আমার সমস্যা বুঝতে চাইছেন না।

আপনি কে আগে বলুন। তারপর অন্য কথা।

বলব। একটু ধৈর্য ধরুন। আগে আর দু'-একটা কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন, কিন্তু প্লিজ আর গল্প ফেঁদে বসবেন না।

টুপু একটু অন্যরকম ছিল। খুব ভাল মেয়ে নয়। অনেক অ্যাফেয়ার ছিল তার।

বিরক্ত হয়ে ধৃতি বলে, এরকম কথা আগেও শুনেছি।

আর একটু শুনুন। প্লিজ।

সংক্ষেপে বলুন।

টুপু অবশেষে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছেলেটা বাজে। কিন্তু টুপুও ভাল নয়। ছেলেটার রোজগারপাতি কিছু ছিল না। তবে খুব হ্যান্ডসাম ছিল, আর সেইটেই একমাত্র তার প্লাস পয়েন্ট। রূপনারায়ণপুরে তারা কিছুদিন ঘরভাড়া করেছিল। তারপর ছেলেটা পালায়। টুপুর তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। চেহারা সুন্দর বলে আবার একজন জুটে যায়। এ বড় কন্ট্রাক্টর। বিবাহিত। ক্রমে টুপু গাঁজা, মদ, ড্রাগের নেশা করতে থাকে। একসময়ে তার জীবনে একটা গভীর জটিল অন্ধকার নেমে আসে। সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল একবার। পারেনি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে এখনও বেঁচে আছে জানলেন কী করে?

জানি না। অনুমান করি।

অনুমানের কোনও বেস নেই?

আছে। টুপু এখনও রূপনারায়ণপুরে আছে বলে খবর পেয়েছি।

আপনি কি তাকে উদ্ধার করতে চান?

যদি চাই, তা হলে সেটা খুব অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে কি?

হচ্ছে। কারণ এসব মেয়েরা বড় একটা ফেরে না। মূল উপড়ে ফেললে কি গাছ বাঁচে?

যদি টুপুর অনুশোচনা এসে থাকে?

ধৃতি একটু হাসল, অনুশোচনা জিনিসটা ভাল। কিন্তু ফেরার পথটাও যে বন্ধ। সংসার তো তার জন্য কোল পেতে বসে নেই। সে এখন কীরকম জীবন কাটাচ্ছে তার খবর রাখেন?

খুব লোনলি।

পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই?

না। টুপুকে এখন সবাই ভয় পায়। তার রূপ গেছে, টাকা নেই, নেশা করে করে কেমন যেন বেকুবের মতোও হয়ে গেছে।

তার চলে কী করে?

যেভাবে চলে তাকে ঠিক চলা বলে না বোধহয়। ধরুন একরকম ভিক্ষে করেই চলে।

ভিক্ষে?

শুনেছি সে একটা নাচগানের স্কুল করছে।

কীরকম স্কুল? চালু?

সে সেই স্কুলে চাকরি করে। নাচ গান শেখায়, সামান্য মাইনে।

তবে তো সে ভালই আছে।

না, মোটেই ভাল নেই। সে ফিরতে চায়।

ফিরতে বাধা কী?

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোথায় সে ফিরবে?

কেন? নিজেদের এলাহাবাদের বাড়িতে?

সে বাড়ি আর ওদের দখলে নেই। বিক্রি হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়িতে আত্মীয়রা তাকে ঢুকতেই দেবে না। তার বিয়ে করারও আর চান্স নেই। তবু সে মাঝে মাঝে ফিরতে চায়। কোথায় তা বুঝতে পারে না।

আমি কী করতে পারি বলুন?

আমার অনুরোধ আপনি একবার ওকে দেখে আসুন।

আপনি কি পাগল? টুপুকে দেখতে যাব কেন?

আপনি তো হিউম্যান স্টোরি খুঁজে বেড়ান। টুপুর ঘটনা কি হিউম্যান স্টোরি নয়?

মোটেই নয়। একটা বেহেড বেলেল্লা মেয়ের অধঃপাতে যাওয়ার গল্পো, তাও যদি সত্যি হয়ে থাকে। আমি এখনও টুপুর গল্প বিশ্বাস করি না। করলেও ইন্টারেস্টেড নই।

আমি যদি সঙ্গে যাই?

আপনি কে?

সেইটেই তো বলতে চাইছি না। তবে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

কাল কেন? আজই নয় কেন?

প্লিজ, কাল। আমি অফিসেই আসব। তিনটেয়। কাল দেরি করবেন না, লক্ষ্মীটি।

ফোন কেটে গেল।

টেবিলে ফিরে আসতেই উমেশবাবু একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, কেসটা কী হে?

আছে একটা কেস। তবে প্রেমঘটিত নয়।

মেয়েছেলের ব্যাপারে বেশি থেকো না। বরং একটা দেখেশুনে ঝুলে পড়ো। ল্যাঠা চুকে যাক। বাঙালির শেষ সম্বল বউয়ের আঁচল।

ধৃতি খুব কষ্টে মুখে একটু হাসি আনল। মনটা একদম হাসছে না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখল, পরমা বাপের বাড়ি গেছে। ডাইনিং টেবিলে একটা চিরকুট: ফোন করে করে অফিসের লাইন পেলাম না। চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। বাবার শরীর ভীষণ খারাপ। প্রেশার হাই। ফ্রিজে রান্নাবান্না আছে, গরম করে খেয়ে নেবেন। পরমা। পুঃ বাবার প্রেশারটা ডিপ্লোম্যাটিকও হতে পারে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে এক ফ্ল্যাটে আছে, এটা বোধহয় পছন্দ নয়। আপনি যে ভেজিটেবল তা তো আর সবাই জানে না! ওখানে কী হল? টুপুর মা কী বলল জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

রাতটা কোনওক্রমে কাটাল ধৃতি। কিছুক্ষণ হাক্সলি পড়ল, কিছুক্ষণ গীতা। ঘুমিয়ে অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে ভারী ভ্যাবলা লাগল নিজেকে।

যখন মুখ ধুচ্ছে তখন কলিংবেল। তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুলে দেখে ফুটফুটে এক যুবতী দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ।

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, আমি নন্দিনী। পরমা বউদি আপনাকে সকালের চা-টা দিতে বলে গেছে।

আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

ওই তো উলটোদিকে। একদিন আসবেন।

আচ্ছা।

কাপটা থাক। পরে আমাদের কাজের মেয়ে নিয়ে যাবে।

ধৃতি সকালবেলাটা খবরের কাগজ পড়ে কাটাল। তারপর সাজগোজ করে হাতে সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়ল। অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেবে।

অফিসেও সময় বড় একটা কাটছিল না। তিনটেয় মেয়েটা আসবে। অন্তত আসার কথা। একটু ভয়-ভয় করছে ধৃতির। সে বুঝতে পারছে একটা জালে জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

তিনটের সময় রিসেপশনে নেমে এল ধৃতি। অপেক্ষা করতে লাগল।

কেউ এল না। ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে সোয়া তিন, সাড়ে তিন ছুঁই-ছুঁই। ধৃতি যখন হাল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আচমকা রিসেপশন কাউন্টারে একটি মেয়ের গলা বলে উঠল, ধৃতি রায় কি আছেন?

মেয়েটা লম্বাটে, রোগাটে, এক বেণীতে বাঁধা চুল। ফরসা? হ্যাঁ, বেশ ফরসা। মুখশ্রী এক কথায় চমৎকার। তবে না, এ আর যেই হোক, টুপু নয়।

রিসেপশনিস্ট কিছু বলার আগেই ধৃতি এগিয়ে গিয়ে বলল, আমিই ধৃতি রায়।

মেয়েটি ধৃতির দিকে চাইল। চমকাল না, বিস্মিত হল না, কোনও রি-অ্যাকশন দেখা গেল না চোখে। তবে একটু ক্ষীণ হাসল।

ধৃতি কাউন্টার পেরিয়ে কাছে গিয়ে বলল, এখানে বসে কথা বলবেন, না বাইরে কোথাও?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? আমি তো অণিমা।

অণিমা?

চিনতে পারছেন না? লক্ষ্মণ কুণ্ডু আমার দাদা। আপনার বন্ধু লক্ষ্মণ।

ধৃতি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তাই তো! এ তো অণিমা। উত্তেজনায় সে চিনতেই পারেনি।

কী চাস তুই?

আমি স্বদেশি আমলের একটা পিরিয়ডের ওপর রিসার্চ করছি। লাইব্রেরিতে পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখব। একটু বলে দেবেন?

ধৃতি বিরক্তি চেপে ফোন তুলে লাইব্রেরিয়ানকে বলে দিল। অণিমা চলে গেলে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর রাগে হতাশায় প্রায় ফেটে পড়তে পড়তে উঠে এল নিউজ রুমে। কে তার সঙ্গে এই লাগাতার রসিকতা করে যাচ্ছে? কেনই বা? সে কি খেলার পুতুল?

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর নিজেকে ডুবিয়ে দিল কাজে। কপির পর কাপি লিখতে লাগল। সঙ্গে চা আর সিগারেট। রাগে মাথা গরম, গায়ে জ্বালা।

কিন্তু সারাক্ষণ রূপনারায়ণপুর নামটা ঘোরাফেরা করছে মনের মধ্যে। গুনগুন করে উঠছে।

ধৃতি রূপনারায়ণপুর গিয়েছিল একবার মাত্র। একজন পলাতক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতা ধরা পড়েছিল রূপনারায়ণপুরে। সেটা কভার করতে। তখন অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। কারও কথা বিশেষ করে মনে নেই। কিন্তু নামটা গুনগুন করছে। রূপনারায়ণপুর! রূপনারায়ণপুর।

তিনদিন বাদে ইনল্যান্ডে চিঠিটা পেল ধৃতি।

"খুব রাগ করে আছেন তো! থাকুন গে। রাগটুকু আমার কথা সারা জীবন আপনাকে বারবার মনে পড়িয়ে দেবে। আপাতত এটুকুই যা আমার লাভ।

"টুপুর কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করেছি। আসলে তা নিজেরই কথা। আমিই টুপু। যা বলেছি তার একবিন্দু মিথ্যে নয়। দেখা করার কথা ছিল। পারলাম না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন।

একবার শিকড় উপড়ে ফেললে গাছ কি বাঁচে? বাঁচলেও আগের মতো আর হয় না।

"রূপনারায়ণপুরে আপনাকে যখন দেখেছিলাম তখন ভীষণ ভাল লেগেছিল। কৌতূহলী, উদ্যমী, সত্যানুসন্ধানী এক সাংবাদিক। উজ্জ্বল, ধারালো, স্ট্রেটকাট। তখন থেকেই আপনার কথা খুব মনে হয়। ভেবেছিলাম, আপনার কাছে একবার এসে সব বলব।

"এলামও, কিন্তু সোজা গিয়ে হাজির হতে পারলাম না। কেমন বুক কাঁপছিল, ভয় করছিল। জীবনে কখনও তো সত্যিকারের প্রেমে পড়িনি। এই বোধহয় প্রথম। কিংবা অন্য এক আকর্ষণ। নানারকম ছলছুতো করলাম। কিন্তু তাতে আড়াল বাড়ল, ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর।

"মরেই গেছি যখন আর বেঁচে উঠবার আকাঙ্ক্ষা কেন? এর কোনও মানে হয় না। নিজে নষ্ট হয়েছি, আপনাকেও নষ্ট করে দেব হয়তো। সুন্দর মুখের অসাধ্যি কী আছে?

"নেশার কথা যা বলেছি তার সবটা সত্যি নয়। হ্যাস খেয়েছি, মদও। নেশা করিনি। কিন্তু অভ্যাস আছে। আর বিয়ের ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা অত ব্যাখ্যা করে হবেই বা কী?

"সেদিন তিনটের সময় গিয়েছিলাম কিন্তু। রিসেপশনের এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। খুব ভিড় ছিল। আপনি আমাকে লক্ষ করেননি। চিনতেও পারতেন না। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ চোখ ভরে আপনাকে দেখলাম। খুব উদ্‌বিগ্ন, রাগী, উত্তেজিত। মনে মনে হাসছিলাম। আর বুকের মধ্যে সে কী দপদপানি।

"পায়ে পড়ি, মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করবেন। আর কিছু চাই না।

"কাছে আসতে পারলাম না, সে আমারই ক্ষতি। আপনার কিছুই হারায়নি। এ দুঃসহ জীবন বহন করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে একটা স্বপ্ন অন্তত চাই। মিথ্যে হোক, তবু চাই। আপনাকে স্বপ্ন করে নিলাম।

"রাগিয়েছি, ভাবিয়েছি, হয়রান করেছি বলে একটুও দুঃখিত নই। বেশ করেছি। আবার যে হাত গুটিয়ে নিলাম, নিজেকে সরিয়ে নিলাম সেইটেই কি কম?

"ভাল থাকবেন।

"কী জানাব আপনাকে বলুন তো? ভালবাসা? প্রণাম? শুভেচ্ছা? যাঃ সবটাই ভারী কৃত্রিম। তার চেয়ে কিছু জানালাম না। জানানোর কী আছে?

"আসি।"

ধৃতি একবার পড়ল। দু'বার। চিঠিটা সে ফেলে দিতে পারত দুমড়ে মুচড়ে। পারল না।

তবে দিনটা তার আজ ভাল গেল না। বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। চিঠিটা তাকে আরও বহুবার পড়তে হবে সে জানে। গভীর রাত্রে, শীতে বা বৃষ্টিতে, দুঃখে বা আনন্দে, একটা মানুষ যে কত সাবলীলভাবে চিঠি হয়ে যায়!

For More Books
Visit

www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com